

মুহতারাম আদনান মারুফ ভাইয়ের
রচনা সমগ্র-১ম পর্ব

১. অত্যাচারী কাফেরদের দুনিয়াতেই শাস্তি অনিবার্য

যে কাফেররা মুসলমানদের উপর অত্যাচার করেছে বা করছে তারা একদিন না একদিন শাস্তি পাবেই। আল্লাহ তায়াল্লা ওয়াদা করেছেন, তিনি দুনিয়াতেই তাদের শাস্তি দিবেন, তাদের শাস্তি দিয়ে মাজলুম মুসলমানদের হৃদয় প্রশান্ত করবেন, আর আল্লাহ তায়াল্লার প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম ঘটে না, আল্লাহ তায়াল্লা বলেন,

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ
الْأَشْهَادُ

“নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, আমি আমার রাসূলগণকে এবং মুমিনদেরকে পার্থিব জীবনেও সাহায্য করি এবং সেই দিনও করবো, যে দিন সাক্ষীগণ দাঁড়িয়ে যাবে।” -সূরা গাফির, ৫১

এ আয়াতের অধীনে ইমাম ইবনে কাসীর রহ. অত্যন্ত চমৎকার হৃদয়-জুড়ানো আলোচনা করেছেন, সে আলোচনা ভাইদের সাথে শেয়ার করার জন্যই এ লেখার অবতারণা। ইবনে কাসীর রহ. বলেন,

قد أورد أبو جعفر بن جرير، رحمه الله تعالى، عند قوله تعالى: {إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} سؤالاً فقال: قد علم أن بعض الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، قتله قومه بالكيفية

كيحيى وزكريا وشعيا، ومنهم من خرج من بين أظهرهم إما مهاجرا كإبراهيم، وإما إلى السماء كعيسى، فأين النصر في الدنيا؟ ثم أجاب عن ذلك بجوابين :
أحدهما: أن يكون الخير خرج عاما، والمراد به البعض، قال:
وهذا سائغ في اللغة

الثاني: أن يكون المراد بالنصر الانتصار لهم ممن آذاهم، وسواء كان ذلك بحضرتهم أو في غيبتهم أو بعد موتهم، كما فعل بقتلة يحيى وزكريا وشعيا، سلط عليهم من أعدائهم من أهانهم وسفك دماءهم، وقد ذكر أن النمرود أخذ الله أخذ عزيز مقتدر، وأما الذين راموا صلب المسيح، عليه السلام، من اليهود، فسلط الله عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم، وأظهرهم الله عليهم. ثم قبل يوم القيامة سينزل عيسى ابن مريم إماما عادلا وحكما مقسطا، فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهود، ويقتل الخنزير، ويكسر الصليب، ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام. وهذه نصره عظيمة، وهذه سنة الله في خلقه في قديم الدهر أنه ينصر عباده المؤمنين في الدنيا، ويقر أعينهم ممن :وحدثه آذاهم، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب". وفي الحديث الآخر: "إني لأتأر لأوليائي كما يتأر الليث الحرب"؛ ولهذا أهلك تعالى قوم نوح وعاد وثمود، وأصحاب الرس، وقوم لوط، وأهل مدين، وأشباهم وأضرابهم ممن كذب الرسل وخالف الحق. وأنجى الله من بينهم المؤمنين، فلم يهلك منهم أحدا وعذب الكافرين، فلم يفلت منهم أحدا

قال السدي: لم يبعث الله رسولا قط إلى قوم فيقتلونه، أو قوما من المؤمنين يدعون إلى الحق فيقتلون، فيذهب ذلك القرن حتى

يبعث الله لهم من ينصرهم، فيطلب بدمائهم ممن فعل ذلك بهم في الدنيا. قال: فكانت (10) الأنبياء والمؤمنون يقتلون في الدنيا، دار 7/150 وهم منصورون فيها. (تفسير ابن كثير ت سلامة طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الثانية 1420هـ)

“ইমাম ইবনে জারীর তবারী রহ. এ আয়াতের তাফসীরে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন, তিনি বলেন, (কুরআন-সুন্নাহ হতে) নিশ্চিতরূপে জানা গেছে যে, কোন কোন নবীকে তার গোত্র হত্যা করে ফেলেছে, যেমন ইয়াহয়া ও যাকারিয়া আলাইহিস সালাম। কোন নবী তার জাতিকে ছেড়ে হিজরত করেছেন। ইসা আলাইহিস সালামকে আকাশে চলে গেছেন। তাহলে দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাদের সাহায্য করলেন কোথায়?

এরপর তিনি এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, আয়াতে ‘সাহায্য করবেন’ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যারা নবী ও মুমিনদের কষ্ট দিয়েছে তাদের পক্ষ থেকে তিনি কাফেরদের উপর প্রতিশোধ নিবেন। তবে এই প্রতিশোধ মাজলুমদের জীবদ্দশায়ও হতে পারে কিংবা তাদের মৃত্যুর পর, তাদের উপস্থিতিতেও হতে পারে কিংবা তাদের হিজরত করে চলে যাওয়ার পর। (যারা অত্যাচার করেছে তাদের উপরও আযাব আসতে পারে কিংবা তাদের উত্তরসূরীদের উপর, যারা পূর্বসূরীদের অত্যাচারে সঙ্কষ্ট এবং সুযোগ পেলে নিজেরাও

অত্যাচারের ইচ্ছা পোষণ করে)

এই প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্তেই তিনি যাকারিয়া ও ইয়াহইয়ার হত্যাকারীদের তাদের শত্রুদের চাপিয়ে দিয়েছেন, যারা তাদের লাঞ্চিত করেছে, তাদের হত্যা করেছে। বর্ণনা করা হয়, আল্লাহ তায়ালা (ইবরাহীমের হিজরতের পর ইবরাহীমকে আগুনে নিক্ষেপকারী বাদশাহ) নমরুদকে কঠিন শাস্তি দিয়েছেন। আর যে ইহুদীরা ইসা আলাইহিস সালামকে শূলিতে চড়াতে চেয়েছিলো, আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর রোমানদের চাপিয়ে দিয়েছেন, যারা তাদের লাঞ্চিত ও অপদস্থ করেছে। অতপর কিয়ামতের পূর্বে ইসা আলাইহিস সালাম আসমান হতে অবতরণ করে দাজ্জাল ও তার বাহিনী ইহুদীদের হত্যা করবেন। তিনি শুকর হত্যা করবেন, ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন এবং জিয়য়ার বিধান রহিত করে দিবেন। যারাই ইসলামগ্রহণ করবে না তাদের সবাইকে তিনি (পাইকারীহারে) হত্যা করবেন। এরচেয়ে বড় প্রতিশোধ আর কী হতে পারে?

বস্তুত, এটাই আল্লাহ তায়ালায় চিরস্থায়ী রীতি, তিনি তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী বান্দাদের সাহায্য করেন, যারা তাদের উপর অত্যাচার করেছে তাদের শাস্তি দিয়ে তিনি মুমিনদের চক্ষু শীতল করেন। সহিহ বুখারীতে আবু হুরাইরা

রাযি. এর সূত্রে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, “যে আমার কোন বন্ধুর সাথে শত্রুরা করে সে প্রকাশ্যে আমার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে”। অপর হাদিসে এসেছে, “আমি আমার বন্ধুদের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করি যেমনিভাবে ক্ষীপ্ত সিংহ প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা নুহ ও লুত আলাইহিস সালামের গোত্র, আদ ও সামুদ জাতি, মাদয়ানবাসী সহ আরো যারা হকের বিরোধীতা করেছে, নবীদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন তাদের সকলকে শাস্তি দিয়েছেন, কাউকে ছাড়েননি। কিন্তু তাদের মধ্য হতে মুমিনদের মুক্তি দান করেছেন, কোন মুমিনকে ধ্বংস করেননি।

সুদী রহ. বলেন, আল্লাহ তায়ালা যখনই কোন নবী বা মুমিনদের কোন দলকে কাফেরদের নিকট প্রেরণ দাওয়াতের জন্য প্রেরণ করেছেন আর তারা তাঁদের হত্যা করেছে, তো সেই প্রজন্ম শেষ হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা তাঁদের পক্ষ হতে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কাউকে প্রেরণ করেন। তাই রাসূলগণ দুনিয়াতে নিহিত হলেও তারা বিজয়ী, সাহায্যপ্রাপ্ত।
-তফসীরে ইবনে কাসীর, ৭/১৫০

এখানে লক্ষ্যনীয় যে, পূর্ববর্তী নবী-রাসূল ও তাদের অনুসারীদের উপর যে কাফেররা অত্যাচার করেছে, আল্লাহ

তায়লা অধিকাংশ সময়ই দুই পদ্ধতিতে তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন, হয়তো তাদের উপর অন্য কোন কাফেরকে চাপিয়ে দিয়েছেন, কিংবা আসমানী গযব নাযিল করেছেন। যেহেতু পূর্ববর্তী অধিকাংশ নবীদের শরিয়তেই জিহাদ ছিলো না তাই তাদের শাস্তির জন্য এ ধরণের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু উম্মতে মুসলিমার উপর যে কাফেররা অত্যাচার করবে তাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়লার রীতি হলো, আল্লাহ তায়লা সাধারণত এই উম্মতের মুজাহিদ হাতেই তাদের শাস্তি দেন। এতে মাজলুম মুসলমানদের অধিক হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে। ইসলামে জিহাদ বিধান থাকার এটিও একটি বড় হিকমত। পূর্ব তুর্কিস্তানের মুসলিমদের উপর নির্মম নির্যাতনকারী চিনা মালাউনরা করোনা ভাইরাসে মরলেও আমাদের অন্তরে শাস্তি আসে, কিন্তু এই মালাউনদের নিজ হাতে কোপাতে পারলে নিসন্দেহে আমাদের অন্তর আরো বেশি প্রশান্তি লাভ করতো। আল্লাহ তায়লা বলেন,

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ
 صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَيَذْهَبْ عَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى مَنْ
 يَسَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো, যাতে আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দান করবেন, তাদেরকে লাঞ্চিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং মুমিনদের অন্তর জুড়িয়ে দেন। এবং তাদের মনের ক্ষোভ

، آج خدا کی تائید و رحمت سے انہی کے رحم و کرم یا عدل و انصاف پر چھوڑ دیے گئے ہیں۔ کفر و باطل کی شوکت و نمائش کو دیکھ کر جو اہل حق گھٹتے رہتے تھے یا جو ضعیف و مظلوم مسلمان کفار کے مظالم کا انتقام نہ لے سکنے کی وجہ سے دل ہی دل میں غیظ کھا کر چپ ہو رہتے تھے جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعہ سے ان کے قلوب تسکین پاتے تھے اور آخری بات یہ ہے کہ خود مجرمین کے حق میں بھی سزا دہی کا یہ طریقہ نسبتاً زیادہ نافع ہے کیونکہ سزا پانے کے بعد بھی رجوع و توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ حالات سے عبرت حاصل کر کے بہت سے مجرموں کو توبہ نصیب ہو جائے چنانچہ حضور پر نور ﷺ کے زمانہ میں ایسا ہی ہوا کہ تھوڑے دنوں میں سارا عرب صدق دل سے دین الہی کا حلقہ بگوش بن گیا۔

“এই আয়াতে জিহাদ শরিয়তসম্মত হওয়ার মূল কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী উম্মতের যে কাহিনীগুলো বিবৃত হয়েছে তা থেকে বুঝে আসে যে, যখন কোন জাতি কুফর ও নবীদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করতো তখন আল্লাহ তায়ালা পক্ষ হতে তাদের উপর ভয়াবহ শাস্তি প্রেরণ করা হতো। যার মাধ্যমে তাদের কুফর ও খারাবী মূহুর্তে শেষ হয়ে যেতো। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ
الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ
اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

“আমি তাদের প্রত্যেককে তার অপরাধের কারণে পাকড়াও করেছি। তাদের কেউ তো এমন, যার বিরুদ্ধে পাঠিয়েছি পাথর বর্ষণকারী ঝড়ো-ঝঞ্ঝা, কেউ ছিল এমন যাকে আক্রান্ত করেছে মহানাদ, কেউ ছিল এমন, যাকে ভূগর্ভে ধবসিয়ে দিয়েছি এবং কেউ ছিল এমন, যাকে করেছি নিমজ্জিত। বস্তুত আল্লাহ এমন নন যে, তাদের প্রতি যুলুম করবেন, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করছিল।” -সূরা আনকাবুত, ৪০

নিসন্দেহে এই শাস্তি অত্যন্ত ভয়ানক ও পরবর্তীদের জন্য শিক্ষণীয় হতো। কিন্তু এক্ষেত্রে শাস্তিপ্ৰাপ্ত ব্যক্তির দুনিয়াতে নিজেদের লাঞ্ছনা ও যিল্লতি দেখে যেতে পারে না এবং তাওবা করে সত্যের দিকে ফিরে আসারও সুযোগ পায় না। তাই আল্লাহ তায়ালা এই উম্মতকে জিহাদের হুকুম দিয়েছেন, যেন হঠকারী ও মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের তিনি নিজে সরাসরি শাস্তি দেবার পরিবর্তে তাঁর বিশ্বস্ত বান্দাদের মাধ্যমে শাস্তি দেন। এভাবে শাস্তি দেয়া হলে, অপরাধীদের যিল্লতি এবং মুমিনদের মর্যাদাবৃদ্ধি বেশি হয়, বিশ্বস্ত বান্দাদের বিজয় ও প্রতাপ প্রকাশ্যে দৃষ্টিগোচর যায়, তাঁদের অন্তর এটা দেখে সান্তনা লাভ করে যে, গতকাল পর্যন্ত যারা

তাঁদের তুচ্ছ ও দুর্বল মনে করে যুলুম করতো, তাঁদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতো আজ তারাই তাঁদের করুণাপ্রার্থী, তাঁদের হাতেই ওদের ভাগ্য। যে নির্যাতিত-নিপীড়িত মুসলিমরা কাফেরদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ না করতে পেরে অন্তরে রাগ চেপে রাখতো, জিহাদের মাধ্যমে তাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। অধিকন্তু অপরাধীদের জন্যও শাস্তি প্রদানের এই পদ্ধতি অধিক কার্যকর। কেননা এক্ষেত্রে শাস্তি পাবার পরও তাওবা করে সত্যধর্ম গ্রহণের পথ খোলা থাকে। অনেক সময়ই শাস্তির ঘটনাবলী থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে বহু অপরাধী তাওবা করার সৌভাগ্য লাভ করে। তাই তো রাসূলের যমানায় জিহাদের কল্যাণে অল্প দিনেই পুরো আরব ইসলামের ছায়াতলে এসে গিয়েছিল।” -তাহসীরে উসমানী, পৃ: ২৪৪ ফরিদ বুক ডিপো।

২.আল্লাহ তায়ালায় সিফাত সংক্রান্ত আকীদার ব্যাপারে আমাদের অবস্থান কেমন হওয়া উচিত?

একভাই আল্লাহ তায়ালায় সিফাত সংক্রান্ত কিছু বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করেন, বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে আমি নতুন থ্রেডে কিছুটা বিস্তারিত জবাব দিচ্ছি।

১। আল্লাহর অবস্থান ও আকার-নিরাকার নিয়ে আমাদের কেমন আক্বিদা রাখা উচিত? এক্ষেত্রে কোন আক্বিদা পোষণ নিরাপদ?

আল্লাহ তায়ালায় অবস্থান, তাঁর সূরত বা আকার সহ আল্লাহ তায়ালায় অন্যান্য সিফাতের বিষয়ে আলেমগণের দুটি প্রসিদ্ধ মতে রয়েছে।

১. তা'বীল। এটা অধিকাংশ মুতাকাল্লিমগণের মায়হাব। এর খোলাসা হলো, এ বিষয়গুলোর বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য না। তাই আল্লাহ তায়ালায় শান উপযোগীভাবে তার ব্যাখ্যা করতে হবে।

২. তাফবীয। এটাই সংখ্যাগরিষ্ঠ সালাফের মায়হাব। এর সারকথা হলো, এই বিষয়গুলো কুরআন-সুন্নাহয় যেভাবে এসেছে, সেভাবেই বর্ণনা করা হবে, তার প্রতি ইমান রাখতে হবে, এগুলোর কোন ব্যাখ্যা করা যাবে না, এবং (আল্লাহ তায়ালায় এ সিফাতগুলো মানুষের সিফাতের মতো) এ ধারণা করা যাবে না এবং এটাও বলা যাবে না যে, এ সিফাতগুলো কেমন?

অবশ্য তাফবীযের পদ্ধতি নিয়ে সালাফের মাঝে কিছু সুক্ষ্ম মতপার্থক্য রয়েছে। কিন্তু আমি যতটুকু উল্লেখ করেছি, তাতে

কোন মতভেদ নেই এবং এতটুকুই আমাদের জন্য যথেষ্ট ইনশাআল্লাহ। এরচেয়ে বেশি কিছু নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর কোনই প্রয়োজন নেই। সাহাবায়ে কেলাম এ বিষয়গুলো বর্ণনা করেছেন, এর অতিরিক্ত কিছু তারা করেননি। সুতরাং তাদের জন্য যা যথেষ্ট হয়েছে, আমাদের জন্য কি তা যথেষ্ট হবে না? অনেক আলেম তো এ কথাও বলেছেন যে, “এ বিষয়ে আমাদের আকীদা, আমাদের গোত্রের বৃদ্ধা মহিলাদের আকীদার মতোই।” অর্থাৎ তাদের যেমন এসব বিষয়ে সুস্পষ্ট জ্ঞান নেই, আমাদেরও এসব বিষয়ে সুস্পষ্ট জ্ঞানের কোন প্রয়োজন নেই।

আরেকটি বিষয়ও স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। সালাফী ভাইয়েরা হানাফীদেরকে মাতুরিদি বলে পথভ্রষ্ট আখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু মাতুরিদিদের পথভ্রষ্ট বলা ঠিক নয়। কেননা তাবীল তো শুধু মাতুরিদিরাই করেন না, আশআরীরাও করেন, তো তাবীলের কারণে পথভ্রষ্ট বলা হলে তো ইমাম নববী, হাফেয ইবনে হাজার রহ. এর মত বড় বড় আশআরী আলেমদেরও পথভ্রষ্ট বলতে হবে!

তাছাড়া হানাফীরা মাতুরিদি এ কথাও ঢালাওভাবে ঠিক নয়। ইমাম আবু মনসুর মাতুরিদির মৃত্যু ৩৩৩ হিজরীতে, তার সমকালীন আরেকজন হানাফী ইমাম হলেন ইমাম তহাবী,

যার মৃত্যু ৩২১ হিজরীতে। তার আকীদার কিতাব পৃথিবীতে আকীদার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য কিতাব হিসেবে গণ্য হয়। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. তাকে “হানাফী মাযহাব সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবগত” বলেও মন্তব্য করেছেন। ইমাম তহাবী তার আকীদার কিতাবের শুরুতে বলেছেন, তিনি এ কিতাবে যে আকীদাগুলো এনেছেন, তা ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. এর আকীদা। আর ইমাম তহাবীর আকীদা ইমাম মাতুরিদির আকীদা হতে ভিন্ন। তিনি সিফাতের মাসয়ালায় তাবীলের বিপক্ষে।

বর্তমান হানাফী আলেমগণও সিফাতের মাসয়ালায় সালাফের মতোই তাফবীয করেন। হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী খানভী রহ. ইমদাদুল ফতোয়ায় এবং আল্লামা তাকী উসমানী দা.বা. তাকমিলাতু ফাতহিল মুলাহিমে তাফবীযকেই অধিক নিরাপদ ও সতর্কতার দাবী বলেছেন। আল্লামা সাইদ আহমদ পালনপুরী বলেছেন, বর্তমান আকাবিরে দেওবন্দও তাফবীযের পক্ষে। বরং, এখনো যারা নিজেদেরকে মাতুরিদি বলে পরিচয় দেন তারাও স্পষ্টভাবে বলেন যে, সিফাতের মাসয়ালায় তারা সাধারণত তাফবীয করেন। সুতরাং এখন এ নিয়ে তর্ক অনেকটাই অর্থহীন। খোরাসানের পূর্ববর্তী কিছু হানাফী ফকিহ ইমাম মাতুরিদির অনুসারী ছিল বিধায় এখন

কবর খুঁড়ে তাদের আকীদা উদ্ধার করে তা নিয়ে বিতর্কের
কি ফায়েরদা?

আর আমাদের জিহাদ বৈশ্বিক জিহাদ এবং এর উদ্দেশ্য
হলো পুরো ইসলামী বিশ্বজুড়ে এক ইসলামী খেলাফত
কায়েম। তাই আমরা বৃহৎ ঐক্যের সার্থে যেমনিভাবে
মাযহাবের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট একটি মাযহাবকে তারজীহ
দেই না, এর প্রচার করি না, বরং যে এলাকায় যে মাযহাব
চলছে, তা অনুযায়ীই ফতোয়া দেই। যদিও কোন কোন
মাসয়ালায় তা আমাদের মতের বিপরীত হয়, যতক্ষণ না তা
কুরআন-সুন্নাহর স্পষ্ট খেলাফ হয়। তো তেমনভাবে আল্লাহ
তায়ালার সিফাতের ক্ষেত্রেও আমাদের অবস্থান এমনই হওয়া
দরকার। আমরা আল্লাহর তায়ালার সিফাতের ব্যাপারে
দলিলের আলোকে যার নিকট যে মতটি অগ্রগন্য তা গ্রহণ
করবো। কিন্তু তার প্রচার এবং তা নিয়ে দলাদলি করে
উম্মাহর ঐক্য ও জিহাদী শক্তিকে বিনষ্ট করা হতে বিরত
থাকবো। নতুবা আমরা কখনোই আমাদের পরম কাঙ্ক্ষিত,
মজলুম মুসলিমদের রক্ষাকবজ, আল্লাহর আইন দ্বারা
পরিচালিত এক বৈশ্বিক খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবো
না।

২। আক্বিদার ক্ষেত্রে বাংলায় একটি নির্ভরযোগ্য আক্বিদার বই রেফার করুন, যেটা থেকে আমি আক্বিদা সংশোধন করতে পারি।

ইমাম তহাবীর আক্বিদার সংক্ষিপ্ত কিতাবটিই ইনশাআল্লাহ এক্ষেত্রে যথেষ্ট। এর বাংলা অনুবাদও হয়েছে, নেটে পাওয়া যায়। আর সাথে বর্তমানে প্রচলিত কুফরের ব্যাপারে অবগতির জন্য মাওলানা আব্দুল মালেক হাফি. এর ‘ইমান সবার আগে’ এবং কাশ্মিরী রহ. এর ‘ওরা কাফের কেন’ এ দুটি কিতাব পড়ে নিতে পারেন।

৩। আমি শাইখ রহমানী যেভাবে আক্বিদা ও মানহাজকে ব্যাখ্যা করতেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমি তা মানি। এটা কী আমার জন্য নিরাপদ?

আমার জানামতে শায়েখ রহমানীর আক্বিদা ও মানহাজে তেমন কোন সমস্যা নেই। সালাফীরা আক্বিদায় ইবনে তাইমিয়াহ রহ. এর অনুসরণ করেন, আর তাফবীযের পদ্ধতি নিয়ে ইবনে তাইমিয়াহর সাথে অন্যদের মতভেদ রয়েছে। তাই রহমানী সাহেবের সাথেও অন্যদের মতভেদ হবে।

তবে এই মতভেদ হক-বাতিল বা ইমান-কুফরের নয়, কারণ আল্লামা তাকী উসমানী বলেছেন, আল্লাহ তায়ালার সিফাতের ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রচলিত মাযহাবগুলোর সবগুলোই হক।

এক্ষেত্রে মতপার্থক্য ইখতেলাফী মাসয়ালায় মুজতাহিদ ফকিহদের মতপার্থক্যের মতোই। তিনি আরো বলেছেন, ইবনে তাইমিয়াহ রহ. এর মতের স্বপক্ষে সালাফের একদল রয়েছে। (দেখুন, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, ৫/৩৭৯-৩৮০ দারু ইহইয়াউত তুরাস) তাই রহমানী সাহেবের আকীদা কমপক্ষে সালাফের একটি দলের আকীদা হবে।

এখন বাকী রইলো, এই মতভেদের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য মত কোনটি। তো আমি আগেও বলেছি, এ নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর কোনই প্রয়োজন নেই, আর না এর সময়-সুযোগ ও যোগ্যতা আমাদের আছে। এসব তো আকীদার শাখাগত বিষয়। এরচেয়ে আকীদার মৌলিক বিষয়াদী অর্থাৎ হাকিমিয়্যাত, ওয়ালা-বারা ইত্যাদি ঠিক করা; গণতন্ত্র, নারীবাদ, জিহাদ ও হুদুদ কিসাসের প্রতি ঘৃণার মতো কুফরী বিষয়াদী সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা; আগ্রাসী শত্রুকে প্রতিহত করা; এ ধরণের কত বড় বড় কাজই তো পড়ে আছে।

৪। গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী মহিলাদের জন্য যারা রোযা রাখতে পারে না, তাদের জন্য ফিদিয়া দেয়া যাবে কিনা?

গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী মহিলারা যদি পূর্ব অভিজ্ঞতা বা দক্ষ মুসলিম ডাক্তারের পরামর্শের কারণে, রোযা রাখার দ্বারা নিজের বা সন্তানের ক্ষতির আশংকা করে তবে তারা রোযা

ভঙ্গ করে পরবর্তীতে কাযা করতে পারবে। আর কাযা
অবশ্যই করতে হবে, কাযা না করে ফিদয়া দিলে হবে না।

(2/ 86) سنن الترمذي ت بشار

حدثنا أبو كريب، ويوسف بن عيسى، قالوا: حدثنا وكيع، - 715

قال: حدثنا أبو هلال، عن عبد الله بن سواده، عن أنس بن
مالك، رجل من بني عبد الله بن كعب قال: أغارت علينا خيل
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم، فوجدته يتغدى، فقال: ادن فكل، فقلت: إني صائم،
فقال: ادن أحدثك عن الصوم، أو الصيام، إن الله تعالى وضع
عن المسافر الصوم، وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع
الصوم أو الصيام، والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم
كليهما أو إحداهما، حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن

(2/ 355) فتح القدير للكمال ابن الهمام

والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أفطرتا)
وقضتا) دفعا للحرج (ولا كفارة عليهما) لأنه إفتار بعذر (ولا
رحمه الله - فيما إذا خافت على -فدية عليهما) خلافا للشافعي
الولد

৩.একটি প্রশ্নের উত্তর:- নারীদের জন্য পুরুষদের ছবি-

ভিডিও দেখার বিধান

কিছুদিন আগে এক বোন প্রশ্ন করেছিলেন, আমাদের বিভিন্ন

প্রকাশনা ও ভিডিওতে নারীদের যে ছবি আসে সেগুলো ঢেকে অস্পষ্ট করে দেয়া হয়, কিন্তু পুরুষের ছবি ঢাকা হয় না। অথচ ভিডিও তো নারীরাও দেখেন, তাহলে কি তাদের গুনাহ হবে না?

তো এর উত্তর হলো:- নারীদের জন্য পুরুষদের দেখার ব্যাপারে আলেমদের দুটি মত রয়েছে,

১. নারীদের জন্য পুরুষকে দেখা হারাম, যেমনিভাবে পুরুষদের জন্য নারীদের দেখা হারাম।
২. যদি ফেতনার আশংকা না থাকে তাহলে নারীদের জন্য পুরুষদের দেখা বৈধ।

যেহেতু উভয় মতের স্বপক্ষেই দলিল রয়েছে তাই সাধারণ অবস্থায় নারীদের জন্য সতর্কতার ভিত্তিতে পুরুষদের থেকে দৃষ্টি অবনত রাখাই বাঞ্ছনীয়। তবে আমরা পুরুষদের যে ছবি-ভিডিও প্রচার করি তা জিহাদের প্রয়োজনেই করে থাকি। এক্ষেত্রে পুরুষদের ছবিও ঢেকে দিলে ছবি-ভিডিওর কোন আবেদন বাকী থাকবে না। আর এসব ছবি-ভিডিওতে সাধারণত আকর্ষণীয় কোন পুরুষের দৃশ্যও না থাকায় ফিতনার আশংকা থাকে না। তাই আশা করি আমাদের বোনেরা শুধু জিহাদের প্রয়োজনে এসব ভিডিও দেখলে কোন সমস্যা নেই। তবে যদি কারো ক্ষেত্রে এসব ভিডিও দেখলেও

ফিতনার আশংকা থাকে তবে তার জন্য তা দেখা বৈধ হবে না। আর বিনা প্রয়োজনে এমনিতেই পুরুষদের ছবি-ভিডিও দেখা থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

এবার মূল মাসয়ালা উভয় পক্ষের দলিল সহ পেশ করছি:-

সহিহ মুসলিমের এক হাদিসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা বিনতে কয়েস রাযি. কে অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম রাযি. এর ঘরে ইদত পালন করতে বলেন। -সহিহ মুসলিম, ১৪৮০

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লামা তাকী উসমানী দা.বা. বলেন,

قوله: «فإنه رجل أعمى» قال النووي: «احتج بعض الناس بهذا على جواز نظر المرأة إلى الأجنبي، بخلاف نظره إليها، وهذا قول ضعيف، بل الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي كما يحرم عليه النظر إليها لقوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} ولأن الفتنة مشتركة وكما يخاف الافتتان بها، تخاف الافتتان به ثم احتج النووي بقوله عليه السلام لأم سلمة وميمونة: «أفعمياوان أنتما؟» ابن أم مكتوم فليس فيه إذن لها في النظر إليه بل فيه أنها تأمن عنده من نظر غيرها وهي مأمورة بغض بصرها فيمكنها

«الاحتراز من النظر بلا مشقة بخلاف بيت أم شريك

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : وأما من قال بجواز نظر المرأة إلى الرجل فاستدل بما أخرجه البخاري في باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم عن عائشة قالت: " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه، وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، حتى أكون أنا التي أسأم". وقال الحافظ تحته: «وظاهر الترجمة أن المصنف كان يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى الأجنبي، بخلاف عكسه، وهي مسألة شهيرة، واختلف الترجيح فيها عند الشافعية، وحديث الباب يساعد من أجاز، وقد تقدم في أبواب العيدين جواب النووي عن ذلك، بأن عائشة كانت صغيرة السن دون البلوغ، أو كان قبل الحجاب ولكن تقدم ما يعكر عليه، وأن في بعض طرقه أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة، وأن قدومهم كان سنة سبع، ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة «فكانت بالغة، وكان ذلك بعد الحجاب

وحجة من منع حديث أم سلمة المشهور: «أفعمياوان أنتما؟» « وهو حديث أخرجه أصحاب السنن، وإسناده قوي. والجمع بين الحديثين احتمال تقدم الواقعة، أو أن يكون في قصة الحديث الذي ذكره نبهان (مولى أم سلمة) شيء يمنع النساء من رؤيته، لكون ابن أم مكتوم أعمى، فلعله كان منه شيء ينكشف ولا «يشعر به».

ثم قال الحافظ: «ويقوي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات، لئلا يراهن الرجال، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء، فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين. وبهذا احتج الغزالي على الجواز، فقال: لسنا نقول إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه، بل هو كوجه الأمرء في حق الرجل،

فيحرم النظر عنه خوف الفتنة فقط، وإن لم تكن فتنة فلا» راجع
فتح الباري تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم - المجلد
الأول (ص: 137)

“ইমাম নববী রহ. বলেন, ‘কেউ কেউ এ হাদিস দিয়ে
মহিলাদের জন্য বেগানা পুরুষের দিকে তাকানো বৈধ
হওয়ার পক্ষে দলিল দিয়েছেন। এ মতটি দুর্বল। বরং
সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম ও অধিকাংশ সাহাবীর মতে নারী-পুরুষ
উভয়ের জন্য একে অপরের দিকে তাকানো হারাম। কেননা
আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ‘(হে নবী!) আপনি মুমিনদের বলে
দিন তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখে, এবং মুমিন
নারীদের বলে দিন, তারাও যেন নিজেদের দৃষ্টি অবনত
রাখে।’ (সূরা নূর, ২৯-৩০) তাছাড়া ফিতনার আশংকা তো
উভয় পক্ষেই রয়েছে।’

এরপর ইমাম নববী রহ. তার বক্তব্যের স্বপক্ষে উম্মে সালামা
ও মাইমুনাহ রাযি. এর হাদিস দিয়ে দলিল দেন, তারা
একদিন রাসূলের কাছে বসা ছিলেন। তখন অন্ধ সাহাবী
আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম রাযি. রাসূলের নিকট আসলে
রাসূল তাদেরকে ভিতরে যেতে বলেন। তারা বললেন, তিনি
তো অন্ধ, আমাদের দেখবেন না? রাসূল বললেন, ‘তোমরাও
কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখতে পাবে না?’ (সুন্নে

তিরমিযি, ২৭৭৮ ইমাম তিরমিযি রহ. সহিহ বলেছেন)

আর যারা জায়েয হওয়ার মত অবলম্বন করেছেন, তারা সহিহ বুখারীতে বর্ণিত আয়েশা রাযি. এর হাদিস দিয়ে দলিল দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘আমি একদিন হাবশীদের খেলা দেখছিলাম। তারা মসজিদের আঙ্গিনায় খেলছিল। আমি খেলা দেখে বিরক্ত না হওয়া পর্যন্ত দেখছিলাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর চাদর দিয়ে আড়াল করে রেখেছিলেন।’)সহিহ বুখারী, (৫২৩৬)

হাদিসের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন, ‘ইমাম বুখারী হাদিসের যে শিরোনাম দিয়েছেন তা থেকে বুঝে আসে, তিনি মহিলাদের জন্য বেগানা পুরুষকে দেখা জায়েয হওয়ার পক্ষে। এটি একটি প্রসিদ্ধ মাসয়লা। এ ব্যাপারে শাফেয়ী মাযহাবের আলেমদের মধ্যে কোন মতটি অগ্রগণ্য তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। উল্লিখিত হাদিসটি বৈধতাকে প্রমাণ করে। ইমাম নববী রহ. এর উত্তরে বলেছেন, আয়েশা তখন ছোট ছিলেন, কিংবা তখনোও পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়নি। কিন্তু হাদিসটির কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, এ ঘটনাটি ঘটেছে হাবশার লোকেরা রাসূলের নিকট প্রতিনিধিরূপে আসার সময়ে। আর তারা এসেছিলেন নবম হিজরীতে। তখন আয়েশা রাযি. এর বয়স ছিল ষোল বছর,

সুতরাং তিনি বালেগাই ছিলেন। আর তখন পর্দার বিধানও অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল।’

এরপর হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন, মুসলমানদের নিরবিচ্ছিন্ন আমল হলো, মহিলারা নেকাব পড়ে মসজিদ, বাজার ও সফরে বের হয়, যেন পুরুষরা তাদের দেখতে না পায়। কিন্তু মহিলারা যেন পুরুষদের দেখতে না পায় এজন্য পুরুষদের কখনো নেকাব পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়নি। এটা পুরুষ-মহিলা দুই শ্রেণীর হুকুম ভিন্ন হওয়ার দলিল। এর আলোকেই ইমাম গাযালী রহ. জায়েয হওয়ার মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, মহিলার জন্য পুরুষের চেহারা দেখা পুরুষের জন্য দাড়িবিহীন বালকের চেহারা দেখার মতো। যদি ফিতনার আশংকা থাকে তবে দেখা হারাম হবে। আর যদি ফিতনার আশংকা না থাকে তাহলে বৈধ হবে।” -
তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, ১/১৩৭

উল্লেখ্য, এ মাসয়ালা ব্যাপকভাবে প্রচার করা কাম্য নয়, কেননা বর্তমান যমানা হিসেবে মহিলারাও পুরুষকে দেখতে পারবে না- এ ফতোয়াই মুনাসিব। শরিয়তের সব মাসয়ালা সবসময় প্রকাশ করা ঠিক না। অনেক সময় জাহেল সুবিধাবাদীরা কিছু কিছু মাসয়ালায় অপব্যবহার করে থাকে। তাই ফতোয়া দেয়ার ক্ষেত্রে সমাজের প্রচলন, প্রশ্নকারীর

অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ের বিবেচনা করা জরুরী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক বৃদ্ধ এসে রোযা অবস্থায় স্ত্রীর সাথে স্ত্রীসুলভ আচরণ করার ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন? রাসূল তাকে অনুমতি দিলেন। এরপর এক যুবক এসে ছবছ একই প্রশ্ন করলে, তিনি তাকে নিষেধ করে দিলেন। -সুনানে আবু দাউদ, ২৩৮৭

অথচ একাধিক সহিহ হাদিসে খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক রোযা অবস্থায় স্ত্রীদের চুমো দেওয়ার বিষয়টি সুপ্রমাণিত। -সহিহ বুখারী, ১৯২৭-১৯২৯ সহিহ মুসলিম, ১১০৬-১১০৮ কিন্তু যেহেতু যুবক স্ত্রীসুলভ আচরণ শুরু করলে নিজেকে এর উপরই সীমাবদ্ধ রাখতে পারবে না। সে আরো আগে বেড়ে যাবে, যা তার রোযা ভঙ্গার কারণ হতে পারে, কিন্তু বৃদ্ধের অবস্থা ভিন্ন। তাই রাসূল দুজনকে ভিন্ন ভিন্ন ফতোয়া দিয়েছেন।

তো ফিতনা-ফাসাদের বর্তমান যুগে পর্দার ব্যাপারে শিথিলতামূলক কোন ফতোয়া প্রচার করা উচিত নয়। মিয়ানুর রহমান আযহারী নারীদের চেহারায় নেকাব ব্যবহারের ব্যাপারে দলিলের আলোকে যে মতভেদ উল্লেখ করেছেন তা সঠিক হলেও এর প্রচার করাটা ঠিক হয়নি। কারণ এখন এমনিতেই নারীরা নেকাব পড়তে চায় না।

আবার যদি তারা শুনে যে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে এবং চেহারা খোলা রাখার পক্ষেও দলিল রয়েছে, তো যারা এখন নেকার পড়ে না তারা তো কখনো নেকাব পড়তে চাইবেই না, বরং যারা নেকাব পড়ে তাদের অনেকেই হয়তো নেকাব খুলে ফেলবে। আযহরী সাহেব যতই বলেন, “চেহারা সৌন্দর্যের রাজধানী, তাই আমার নিকট চেহারা ঢেকে রাখার মতটিই রাজেহ-অগ্রগণ্য”- এতে হয়তো খুব বেশি কাজ হবে না।

যেহেতু প্রশ্ন এসেই গেছে, তাই বাধ্য হয়ে উত্তর দিতে হলো। তাছাড়া আশা করি জিহাদের প্রতি আগ্রহী বোনেরা এ ফতোয়ার অপব্যবহারও করবেন না। আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

৪.একটি ভুল আমল, জুমার নামায ও ফরয নামাযের পরে সুনতের পূর্বে দীর্ঘ দোয়া করা।

ফরয নামাযের পরে সম্মিলিত করা যাবে কি না, এ ব্যাপারে আমাদের আকাবিরদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে, ইমাম শাতেবী আল ই’তিসাম গ্রন্থে একে বিদআত বলেছেন, (পৃষ্ঠা: ২৬৩-২৬৭ দারুল হাদিস) মেখল মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মুফতীয়ে

আযম মুফতী ফয়জুল্লাহ সাহেবও একে বেদআত গণ্য করতেন। হাটহাজারী মাদ্রাসায়ও ফরয নামাযের পরে মুনাযাত হয় না। তবে আকাবিরে দেওবন্দ ও অধিকাংশ কওমী আলেমগণ এতে তেমন সমস্যা মনে করেন না। এ নিয়ে আহলে হাদিস বন্ধুরা আমাদের সমালোচনা করেন, কিন্তু আমাদের মতে এধরণের সাধারণ বিষয় নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ ও উম্মতের মধ্যে বিভেদ-বিসংবাদ সৃষ্টি করা কাম্য নয়।

তবে একটি বিষয় হাদিসে সুস্পষ্টরূপে এসেছে, এবং এতে কারো কোন মতভেদও নেই, তা হলো ফরয ও সুন্নতের মধ্যে বেশি সময় বিলম্ব না করা। সুতরাং ফরয নামাযের পরে সুন্নত থাকলে দোয়া করা বা আযকার পড়ার জন্য বেশি সময় বিলম্ব করা যাবে না। ফুকাহায়ে কেলাম বলেছেন, ফরয নামাযের পর সুন্নত থাকলে সুন্নতের পরে আযকার পড়াই মুস্তাহাব, এখন বিভিন্ন নামাযের পরে সুন্নতের পূর্বে, বিশেষকরে জুমুআর নামাযের পরে আমরা যে দীর্ঘ দোয়া করি এটা হাদিসের খেলাফ এবং হানাফী মাযহাবেরও খেলাফ।

আয়েশা রাযি. বলেন,

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام»

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয নামাযের সালাম ফিরানোর পরে আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওমিনকাস সালাম তাবারকতা জাল জালালি ওয়াল ইকরাম এই দোয়া পড়তে যতটুকু সময় প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি বসতেন না। -সহিহ মুসলিম, হাদিস: ৫৯২

সাওবান রাযি. বলেন,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام» قال الوليد: فقلت للأوزاعي: " كيف تقول: أستغفر الله، أستغفر الله: الاستغفار؟ قال

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের পরে তিনবার ইস্তেগফার পড়তেন, এরপর اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام এই দোয়া পড়তেন। -সহিহ মুসলিম, হাদিস ন: ৫৯১

হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত আলেম ইবনুল হুমাম রহিমাহুল্লাহু বলেন,

إن المسنون عدم الفصل بين الفريضة والسنن إلا قدر ما يقول:
اللهم أنت السلام" الخ. كما في حديث عائشة عند مسلم
والترمذي. اهـ.

সুন্নত তরীকা হলো ফরয ও সুন্নত নামাযের মধ্যে আল্লাহুস্মা
আনতাস সালাম এ দোয়া পড়তে যতটুকু সময় লাগে তার
চেয়ে বেশি বিলম্ব না করা। -ফাতহুল কাদীর, ১/৪৪০ দারুল
ফিকর।

বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, ফতোয়ায়ে শামী, ১/৫৩০
দারুল ফিকর।

উল্লেখ্য, আল্লামা শামী সহ হানাফী মাযহাবের মুহাক্কিক
ফকীহগণ ফরয নামাযের পরে লম্বা দোয়া করা বা আযকার
পড়াকে মাকরুহ তানযীহ বা অনুত্তম বলেছেন, সুতরাং এ
নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি বা ঝগড়া-বিবাদ করা আমাদের
উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য শুধু হাদিস ও ফিকহের
আলোকে সঠিক মাসয়ালাটি মানুষকে জানানো। আল্লাহ
আমাদের সহিহ আমল করার তাওফিক দান করুন।

৫. কম্পিউটার ও ল্যাপটপের ডিফল্ট ফন্ট হিসেবে ভিরিভার পরিবর্তে কালপুরুস বা অন্য কিছু সেট করার পদ্ধতি

কম্পিউটার ও ল্যাপটপে ডিফল্ট ফন্ট হিসেবে থাকে ভিরিভা, কিন্তু এ ফন্ট আমাদের অনেকেই পছন্দ না, যারা বিজয় ইউনিকোর্ডের মাধ্যমে কম্পোজ করেন, আর ভিরিভা ব্যতীত অন্য কোন ফন্ট ব্যবহার করেন, তারা বেশ সমস্যায় পড়েন, বারবার ফন্ট অটোমেটিক ভিরিভা হয়ে যায়, আমি নিজেও এর ভুক্তভোগী, কিন্তু এর সমাধান খুবই সহজ, প্রথমে

<https://www.omicronlab.com/tools/font-fixer.html> এই লিংক থেকে font fixer 2.0.0

ডাউনলোড করে নিন, এরপর সেটা ওপেন করে choose a font from the list লেখা অপশনে ক্লিক করে কালপুরুশ বা সোনার বাংলা কোন একটি সিলেক্ট করে নিন, এরপর fix it এ ক্লিক করুন, এরপর পিসি রিস্টার্ট চাইলে রিস্টার্ট দিন। আর যারা অত্র ব্যবহার করেন, তারা অত্রের সেটিংশ অপশনে গেলেই font fixer: set default bangla font নামের অপশন পেয়ে যাবেন। পরবর্তীতে যদি পুনরায় ভিরিভা সেট করতে চান তাহলে fix it এর পাশের বাটন restore এ ক্লিক করুন। এরপর রিস্টার্ট দিন।

আপনি যে ডিফল্ট ফন্ট সেট করবেন, মাইক্রোসফট অফিস,

অনলাইন ও অফলাইন সবখানেই সেই ফন্ট আসবে,
এমনকি আমাদের প্রিয় দাওয়াহ ইলাল্লাহ সাইটেও। আমার
কাছে কালপুরুস ফন্টটাই সবচেয়ে পছন্দ, এ ফন্টটা সেট
করলে যদিও দাওয়ায় লেখার সাইজ একটু ছোট দেখা যায়,
কিন্তু এতে তেমন সমস্যা নেই, কারণ আপনি সহজেই
ডানপাশের open menu তে গিয়ে লেখাটা zoom করে
নিতে পারেন।

৬.কাফেরদের সাথে অনির্দিষ্ট মেয়াদে সন্ধি-চুক্তির বিধান
(তালেবানদের ব্যাপারে একটি সংশয়ের জবাব)

(কিছুদিন পূর্বে আমেরিকার সাথে তালেবানদের যে চুক্তি হয়েছে তা নিয়ে অনেকেই সংশয়ে ভুগছেন। কেউ কেউ দাওয়ায় প্রশ্নও করেছেন। সম্ভবত চুক্তিতে কোন মেয়াদ উল্লেখ না থাকায় তাদের নিকট এটা চিরস্থায়ী চুক্তি বলে মনে হয়েছে। কিন্তু আসলেই কি এটা চিরস্থায়ী চুক্তি, না কি অনির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তি? অনির্দিষ্ট মেয়াদে চুক্তি করা কি বৈধ? এ বিষয়গুলো সুস্পষ্ট করার জন্যই এ প্রবন্ধের অবতারণা।)

জুমহূর-সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের মতে কাফেরদের সাথে অনির্দিষ্ট মেয়াদে সন্ধি-চুক্তি করা জায়েয নেই। কিন্তু হানাফী মাযহাব অনুযায়ী কাফেরদের সাথে অনির্দিষ্ট মেয়াদে সন্ধি-চুক্তি করাও জায়েয। কেননা খোদ রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম একাধিক গোত্রের সাথে সময় নির্ধারণ ব্যতীত সন্ধি করেছিলেন। হাদিসে এসেছে,

عن زيد بن أثير، قال: سألت علياً بأي شيء بعثت؟ قال: بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهدة إلى مدته، ومن لا

مدة له فأربعة أشهر.. رواه الترمذي (871) وقال: حديث حسن
صحيح

‘যায়েদ বিন উসাই রহ. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আলী রাযি. কে প্রশ্ন করলাম, (নবম হিজরিতে সূরা তাওবা অবতীর্ণ হওয়ার পর) কি কি বিষয় ঘোষণা করার জন্য আপনাকে (মক্কায়) পাঠানো হয়েছিল? তিনি বললেন, চারটি বিষয় (ঘোষণা করার জন্য)। মুসলিম ছাড়া আর কোন লোক জান্নাতে যাবে না; কোন লোক উলঙ্গ অবস্থায় বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারবে না; এইখানে (কা'বা শরিফে) মুসলিম ও মুশরিকরা এই বছরের পর একত্র হতে পারবে না এবং যে সব লোকের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুক্তি আছে সে সব লোকের চুক্তি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে, কিন্তু যে সব লোকের চুক্তিতে কোন মেয়াদের উল্লেখ নেই সে সব লোকের চুক্তির মেয়াদ (আজ হতে) চার মাস পর্যন্ত।’ ইমাম তিরমিযি রহ. হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। -জামে তিরমিযি: ৮৭১ হাদিসবিডি, লিংক:

<https://www.hadithbd.com/hadith/sear...1&WADbSearch1=>

হাদিসটি উল্লেখ করার পর হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন,

واستدل بهذا الكلام الأخير على أن قوله تعالى: ﴿فسيحوا في الأرض أربعة أشهر﴾ يختص بمن لم يكن له عهد مؤقت أو لم يكن له عهد أصلاً، وأما من له عهد مؤقت فهو إلى مدته، فروى الطبري من طريق ابن إسحاق، قال: هم صنفان: صنف كان له عهد دون أربعة أشهر فأمهل إلى تمام أربعة أشهر، وصنف كانت له مدة عهده بغير أجل فقصرت على أربعة (8/319: أشهر). (الفتح)

‘(যে সব লোকের চুক্তিতে কোন মেয়াদের উল্লেখ নেই সে সব লোকের চুক্তির মেয়াদ আজ হতে চার মাস পর্যন্ত) এই শেষ বাক্যটি প্রমাণ করে আল্লাহ তায়ালার বাণী ‘(হে মুশরিকরা! আরবের) ভূমিতে চার মাস পর্যন্ত তোমাদের স্বাধীনভাবে বিচরণ করার অনুমতি রয়েছে’ (সূরা তাওবা: ২) ঐ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদে কোন চুক্তি ছিল না, কিংবা তাদের সাথে কোন চুক্তিই ছিল না। আর যাদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদে চুক্তি ছিল তাদের চুক্তি মেয়াদ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তবারী রহ. ইবনে ইসহাক রহ. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যে সকল মুশকিরদের সাথে চুক্তি করা হয়েছিল তাদের দুটি দল ছিল। একদলের সাথে চুক্তির মেয়াদ পুরো হতে চার মাসেরও কম বাকী ছিল। তাদেরকে মেয়াদ বাড়িয়ে চারমাস পর্যন্ত সময় দেয়া হয়। অপর দলের সাথে চুক্তির কোন নির্দিষ্ট মেয়াদ ছিল না। তাদের জন্য চারমাসের মেয়াদ নির্ধারণ করে দেয়া হয়।’ -

ফাতহুল বারী: ৮/৩১৯

ইমাম ইবনে কাসীর রহ. বলেন,

هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة، أو من له عهد
دون أربعة أشهر، فيكمل له أربعة أشهر، فأما من كان له عهد
مؤقت فأجله إلى مدته، مهما كان، لقوله تعالى: ﴿فَأْتَمُوا إِلَيْهِمْ
عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مَدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ ولما في الحديث: «ومن
كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهداه إلى
مدته». وهذا أحسن الأقوال وأقواها، وقد اختاره ابن جرير،
رحمه الله، وزُوي عن الكلبي ومحمد بن كعب القرظي، وغير
واحد. (تفسير ابن كثير: 4/102)

‘(উল্লিখিত আয়াতটি) ঐ মুশরিকদের জন্য যাদের সাথে
অনির্দিষ্ট মেয়াদে চুক্তি ছিল কিংবা যাদের চুক্তির মেয়াদ পুরো
হতে চার মাসেরও কম বাকী ছিল। তাদেরকে চারমাস পর্যন্ত
সময় দেয়া হয়। পক্ষান্তরে যাদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদে চুক্তি
ছিল তাদের চুক্তি মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে,
চাই মেয়াদ যতদিনই হোক। কেননা আল্লাহ তায়ালা
(পরবর্তীতে) বলেছেন, ‘তবে যে মুশরিকদের সাথে তোমরা
চুক্তি সম্পন্ন করেছো ও পরে তারা তোমাদের চুক্তি রক্ষায়
কোনও ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে
সহযোগিতাও করেনি, তাদের সাথে কৃত চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ
করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সাবধানতা অবলম্বনকারীদের পছন্দ

করেন।' (সূরা তাওবা: ৪) এবং হাদিসে এসেছে, 'যে সব লোকের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুক্তি আছে সে সব লোকের চুক্তি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।' এই মতটিই সবচেয়ে উত্তম ও শক্তিশালী। ইবনে জারীর তবারী রহ. এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। কালবী রহ., মুহাম্মদ বিন কা'ব কুরায়ী রাযি. প্রমুখ থেকে এ মতটি বর্ণিত হয়েছে।' -তায়সীরে ইবনে কাসীর: ৪/১০২

মওসূয়াহ ফিকহিয়াহয় বলা হয়েছে,

وذهب الحنفية إلى أن عقد المواعدة يصح أن يكون مطلقاً عن
 المدة ، ويصح أن يكون مؤقتاً بمدة معينة الموسوعة الفقهية
 الكويتية (42/ 212)

'হানাফীদের মতে নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট উভয় মেয়াদেই সন্ধি-
 চুক্তি করা জায়েয।' -মওসূয়াহ: ৪২/২১২

এক্ষেত্রে জুমহুরের পক্ষ হতে হানাফীদের উপর আপত্তি
 তোলা হয় যে, অনির্দিষ্ট মেয়াদে সন্ধি করা হলে তো
 চিরস্থায়ীভাবে জিহাদের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। যতদিন পর্যন্ত
 কাফেররা নিজেরা আগে বেড়ে আমাদের সাথে কৃত সন্ধি
 ভঙ্গ না করবে ততদিন আমাদের শক্তি থাকলেও হাত গুটিয়ে
 বসে থাকতে হবে। অথচ ইসলামে সন্ধির উদ্দেশ্য তো হলো

জিহাদের জন্য প্রস্তুতিগ্রহণ। চিরতরে জিহাদ বন্ধ করে দেয়া নয়। এজন্যই শুধুমাত্র দুর্বলতার সময়েই সন্ধি করা জায়েয, শক্তি থাকার সময়ে সন্ধি করা জায়েয নেই। ইমাম কাসানী রহ. বলেন,

وشرطها الضرورة، وهي ضرورة استعداد القتال، بأن كان بالمسلمين ضعف، وبالكفرة قوة المجاوزة إلى قوم آخرين، فلا تجوز عند عدم الضرورة؛ لأن المودة ترك القتال المفروض، فلا يجوز إلا في حال يقع وسيلة إلى القتال؛ لأنها حينئذ تكون قتالا معنى قال الله - تبارك وتعالى - {فلا تهنوا وتدعوا إلى وعند تحقق الضرورة لا بأس. السلم وأنتم الأعلى والله معكم} به؛ لقول الله - تبارك وتعالى - {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله} وقد روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم وادع أهل مكة عام الحديبية على أن توضع الحرب عشر - سنين

‘সন্ধি-চুক্তি জায়েয হওয়ার শর্ত হলো, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার প্রয়োজন। অর্থাৎ যখন মুসলমানরা কাফেরদের তুলনায় দুর্বল হবে তখন তাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজনে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ বন্ধের সন্ধি করা জায়েয হবে। (পক্ষান্তরে যখন মুসলমানদের জিহাদ করার মতো যথেষ্ট শক্তি থাকবে তখন এ প্রয়োজন না থাকার কারণে সন্ধি করা জায়েয হবে না)। কেননা সন্ধির মাধ্যমে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায়, যা আমাদের উপর ফরয। সুতরাং সন্ধি তখনই

বৈধ হবে যখন তা যুদ্ধের মাধ্যম (অর্থাৎ প্রস্তুতির কারণ) হবে। কেননা তখন তা যুদ্ধের হুকুমেই হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘তোমরা হীনবল হয়ে সন্ধির প্রস্তাব দিয়ো না, এমতাবস্থায় যে তোমরা শক্তিশালী। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সাথে রয়েছেন। (সূরা মুহাম্মদ: ৩৫) আর যখন সন্ধির প্রয়োজন দেখা দিবে তখন তাতে কোন সমস্যা নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘যদি তারা সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে তোমরাও সে দিকে ঝুঁকে পড়বে এবং আল্লাহর উপর নির্ভর করবে।’ (সূরা আনফাল: ৬১) হাদিসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদের সাথে দশবছর যুদ্ধবিরতির চুক্তি করেছিলেন। -বাদায়েউস সানায়ে: ৭/১০৮

তবে এ আপত্তি জুমহুরের মাযহাবের ভিত্তিতেই হতে পারে। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী এ আপত্তি হয় না। কেননা হানাফী মাযহাব অনুযায়ী সন্ধি-চুক্তি হলো এমন চুক্তি যা যেকোনো সময় শেষ করে দেয়া জায়েয়। চাই চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ হোক বা না হোক। তাই ইমামুল মুসলিমিন যখন মনে করবেন এখন কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করার মতো পর্যাপ্ত শক্তি অর্জন হয়ে গেছে তখনই তিনি কাফেরদের জানিয়ে দিয়ে দিবেন যে, এখন থেকে তোমাদের সাথে আমাদের কোন সন্ধি নেই। অবশ্য তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে তাদেরকে কিছুদিন সময় দেয়া হবে যেন তারা নিজেদের সব অঞ্চলে

সন্ধি শেষ হয়ে যাওয়ার সংবাদ পৌঁছাতে পারে এবং সন্ধির পূর্বে তারা যেভাবে আত্মরক্ষার জন্য সতর্ক ছিল সেভাবেই সতর্ক হয়ে যেতে পারেন। এই ঘোষণা দেয়ার উদ্দেশ্যে হলো তাদের সাথে গাদ্দারী থেকে বেঁচে থাকা। নতুবা সন্ধির কারণে যদি কাফেররা অপ্রস্তুত অবস্থায় থাকে আর মুসলমানরা তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে তবে তা প্রতারণা হয়ে যাবে। আর জুমহুরের মতে সন্ধি শেষ করার জন্য কাফেরদের পক্ষ হতে সন্ধিভঙ্গের আশংকা হওয়া শর্ত। সুতরাং জুমহুরের মতে যদি কাফেররা সন্ধিভঙ্গ না করে এবং তাদের ব্যাপারে সন্ধিভঙ্গের আশংকাও না হয় তাহলে মুসলমানরা সন্ধির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে সন্ধি শেষ করে যুদ্ধ করতে পারবে না। (মওসূয়্যাহ ফিকহিয়্যাহ: ২০/১৮৯; মাবসুত: ১০/৮৬; বাদায়ে: ৭/১০৯)

জুমহুর নিম্নোক্ত আয়াতটি দিয়ে দলিল দেন,

وَأِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْخَائِنِينَ

‘তোমরা যদি কোনও সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা করো, তবে তুমিও সে চুক্তি সোজা তাদের দিকে ছুঁড়ে মারো। স্মরণ রেখ, আল্লাহ বিশ্বাস ভঙ্গকারীদেরকে পছন্দ করেন না। -সূরা আনফাল: ৫৮

হানাতীদেব পক্ষ হতে এব জবাবে বলা হয়, যেহেতু আল্লাহ তায়ালা পবরীকার বলে দীয়েছেন, কাফের-মুশরীকদেব অভ্যাসই হলো সুযোগ পেলে সন্ধী ভঙ্গ করা, (সূরা তাওবা: ৭-১০) তাই তাদেব পক্ষ হতে সন্ধী ভঙ্গের ভয় সবসময়ই বীদ্যমান। সুতরাং ‘তোমরা যদি কোনও সম্প্রদায়েব পক্ষ হতে বীশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা করে’ এই বাক্যটি সন্ধী শেষ করে দেয়ার শর্ত হিসেবে বলা হয়নি। বরং এব মাধ্যমে একটি বাস্তবতাকেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যাকে আরবি পবরীভাষায় ‘কয়দে ইত্তেফাকী’ বলা হয়। ইমাম ইবনুল হুমাম রহ. এব বক্তব্য দেখুন,

وإن صالحهم مدة ثم رأى أن نقض الصلح أنفع نبذ إليهم) أي ألقى إليهم عهدهم وذلك بأن يعلمهم أنه رجع عما كان وقع، قال تعالى {وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء} [الأنفال: 58] أي على سواء منكم ومنهم في العلم بذلك، لكن ظاهر الآية أنه مقيد بخوف الخيانة، وهو مثل {إن علمتم فيهم خيرا} [النور: 33] في الكتابة، ولعل خوف الخيانة لازم للعلم بكفرهم وكونهم حربا علينا. والإجماع على أنه لا يتقيد بخطر الخوف؛ لأن المهادنة في الأول ما صحت إلا لأنها أنفع فلما تبدل الحال عاد إلى المنع (فتح القدير للكمال ابن الهمام 5/

(457

আর অনির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তি যে চিরস্থায়ী হয় না, তা যেকোন সময় ভঙ্গ করা জায়েয, এ ব্যাপারে হানাফীদের দলিল হলো জামে তিরমিযির উপরোক্ত হাদিস ও তার ব্যাখ্যায় আলেমদের বক্তব্য। কেননা যাদের সাথে অনির্দিষ্ট মেয়াদে চুক্তি হয়েছিল তাদেরকে চার মাসের সময় বেঁধে দেয়া হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল চার মাস পর তাদেরকে যেখানে পাওয়া যাবে হত্যা করা হবে। (সূরা তাওবা: ৫) এক্ষেত্রে তাদের থেকে সন্ধি ভঙ্গের আশংকা প্রকাশ পাওয়া গেছে কি না? এ বিষয়ে কোন ভ্রক্ষেপই করা হয়নি। সুতরাং এ থেকে সুস্পষ্টরূপে বুঝে আসে, যে সকল কাফেরদের সাথে অনির্দিষ্ট মেয়াদে চুক্তি করা হয়, তাদের থেকে চুক্তি ভঙ্গের আশংকা থাক বা না থাক, উভয় অবস্থায়ই তাদেরকে চুক্তি শেষ হওয়ার বিষয়টি জানিয়ে দিলে এবং এই ঘোষণার পর তাদেরকে কিছুদিন সময় দিলে, এরপর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে কোন সমস্যা নেই।

আশা করি উপরোক্ত আলোচনা হতে সুস্পষ্ট হলো কাফেরদের সাথে অনির্দিষ্ট মেয়াদে চুক্তি করা জায়েয এবং হানাফী মাযহাব মতে অনির্দিষ্ট মেয়াদে চুক্তি করা আর চিরস্থায়ী চুক্তি করা এক জিনিষ নয়। আর তালেবানরা যেহেতু হানাফী মাযহাবের অনুসারী, তাই তারা নিজেদের

মাযহাব অনুযায়ী অনির্দিষ্ট মেয়াদে চুক্তি করতেই পারেন। বিশেষকরে যেহেতু অনির্দিষ্ট মেয়াদে চুক্তি করার স্বপক্ষে সহিহ হাদিসও রয়েছে। তাই এ নিয়ে তাদের উপর আপত্তির কোন সুযোগ নেই।

পরিশেষে বলবো, আমাদের অবস্থা যেন এমন না হয় যে, পান থেকে চুন খসলেই আমরা জিহাদি সংগঠনের বিপক্ষে আপত্তি শুরু করবো। কেননা জিহাদি তানযীম ও তাদের উমারাগণ ফেরেশতাদের মত মাসুম নন। তাদের দ্বারা এমন কোন কিছু প্রকাশ পেতেই পারে যা শরিয়তের খেলাফ (কমপক্ষে আমাদের দৃষ্টিতে)। তখন তাদেরকে নসীহত করা যাবে। কিন্তু তাই বলে তাদের সমালোচনা করা হলে কিংবা তাদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা হলে আমরা কখনোই কোন জামাতের সাথে মিলে জিহাদ করতে পারবো না। বরং আমাদের অবস্থা হবে সেই সব আরব মুজাহিদদের মতো যারা শায়েখ উসামা ও শায়েখ আইমান প্রমুখকে তাকফীর করে জিহাদ হতে ফিরে গিয়েছিল কিংবা সেই সব আইএস সদস্যদের মতো যারা বাগদাদী ও আদনানীকেও তাকফীর করেছিল। সুতরাং আমাদের এক্ষেত্রে লক্ষ্য করতে হবে তারা যে ভুল করছেন তা কি জিহাদের মৌলিক উদ্দেশ্যের পরিপন্থী কি না? যদি তা জিহাদের মৌলিক উদ্দেশ্যের পরিপন্থী না হয় তবে যথাসম্ভব ছাড় দিতে হবে। কিন্তু কোন তানযীমের ভুল যদি জিহাদের মৌলিক উদ্দেশ্যের পরিপন্থী

হয়, যেমন কোন দল শরিয়ত প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আস্থান জানায়, কিংবা কোন দল সাধারণ মুসলিমদের নিরাপত্তা দানের পরিবর্তে তাদেরকে হত্যা করা শুরু করে, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ না করে মুজাহিদদের সাথেই যুদ্ধ করে তখন সে দল পরিত্যাগ করা ওয়াজিব হবে। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ. কতই না সুন্দর বলেছেন,

نعم إذا رأوا منه كفرا بواحا لا يبقى فيه تأويل، فحينئذ يجب عليهم أن يخلعوا ربقتة عن أعناقهم، فإن حق الله أوكد. ثم هل من طاقة البشر أن لا يختار إلا حقا في جميع الأبواب، فإذا تعذر أخذ الحق في جميع الأبواب - وإن أمكن ذهننا - لا بد أن يحد له حد، وهو الإغماض في الفروع، فإذا وصل الأمر إلى الأصول حرم السكوت، ووجب الخلع. وهو معنى قوله: «وإن أمر عليكم عبد حبشي». فافهم. (فيض الباري: 6 : 459 ط. دار (الكتب العلمية: 1426 هـ).

“হাঁ, প্রজারা যদি শাসক থেকে কোন সুস্পষ্ট কুফর দেখতে পায়, যাতে তাবীলের কোন অবকাশ থাকে না, তখন তাদের উপর আবশ্যিক হবে তার থেকে আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নেয়া। কেননা মানুষের জন্য (মানবীয় দুর্বলতাবশত) সবক্ষেত্রে হক অবলম্বন করা সম্ভব হয় না, তাই শাসকের ছোট-খাট বিচ্যুতির ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না, কিন্তু যখন শাসকের বিচ্যুতি ইসলামের মৌলিক বিষয়ের

সাথে সাংঘর্ষিক হবে তখন চুপ থাকা হারাম হবে, এবং তাকে অপসারণ করা ফরজ হবে। এটাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, “যদিও তোমাদের উপর কোন হাবশিকে আমীর নিযুক্ত করা হয় যে তোমাদের আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করে তাহলে তোমরা তার আনুগত্য করো” এর অন্তর্নিহিত অর্থ।” -ফয়যুল বারী, ৬/৪৫৯

৭. কিছু অসাধারণ ভিডিও

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُفْقَهُنَّهَا
ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ

কাফেররা তাদের সম্পদ ব্যয় করে মানুষকে আল্লাহর পথ হতে ফিরিয়ে রাখার জন্য, তারা (এজন্য বিপুল) সম্পদ ব্যয় করে (নিশ্চয় হয়ে যাবে) অতপর তাদের জন্য এই সম্পদ ব্যয় আফসোসের কারণ হবে, এরপর তারা (চূড়ান্তরূপে) পরাজিত হবে। -সূরা আনফাল, আয়াত, ৩৬।

আলহামদুলিল্লাহ, ইতোমধ্যেই কাফেররা মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে ৪.৮ ট্রিলিয়ন (১ ট্রিলিয়ন = ১০০০ বিলিয়ন, ১ বিলিয়ন = ১০০০ মিলিয়ন, ১ মিলিয়ন = ১০

লাখ সুতরাং ৪ ট্রিলিয়ন =৪০ হাজার কোটি) ডলার খরচ করে নিজেদের অর্থনীতি ধ্বসিয়ে দিয়েছে এবং যুদ্ধব্যায়ের জন্য আফসোস শুরু করেছে, সুতরাং এরপরেই আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা অনুযায়ী ওদের জন্য অপেক্ষা করছে চূড়ান্ত পরাজয় ইনশাআল্লাহ।

রাসূলের সীরাত থেকেও আমরা এমনটাই দেখতে পাই, বদর, উহুদ ও খন্দক এবং অসংখ্য সারিয়্যাহর কল্যাণে কুরাইশের অর্থনৈতিক পতন ঘটে। ওদের অর্থনীতির মূল উৎস শাম ও ইয়ামানের ব্যবসা মুসলিম সারিয়্যার আক্রমণের ভয়ে বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। খন্দকের যুদ্ধে ওদের শোচনীয় পরাজয়ের পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم
 ওদের উপর আক্রমণ করবো, ওরা আর আমাদের উপর
 আক্রমণ করতে পারবে না। সহিহ বুখারী, ৪১১০ অর্থাৎ
 যুদ্ধব্যায়ের কারণে ওদের শক্তি এতটাই খর্ব হয়ে গিয়েছে
 যে, মুসলমানদের উপর আগবেড়ে আক্রমণের শক্তি আর
 এখন ওদের বাকী নেই। হুদইবিয়ার সন্ধির সময় রাসূল
 সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন، يا ويح قريش،
 آفسس كرتهم الحرب
 আফসোস কুরাইশদের জন্য, যুদ্ধ ওদের
 নিস্ব বানিয়ে দিয়েছে, (কিন্তু এরপরও ওরা আমার সাথে যুদ্ধ

হতে বিরত হচ্ছে না) -মুসনাদে আহমদ, 18910 শায়েখ
শুয়াইব আরনাউত হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

আমেরিকার সাথে চলমান যুদ্ধেও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি
ঘটছে, ৯/১১ পরবর্তী সময়ে আমেরিকা যুদ্ধ করতে করতে
নিস্ব হয়ে যাচ্ছে, আর এভাবেই আয়াতে বর্ণিত আল্লাহ
তায়ালার ওয়াদা সত্য হচ্ছে, চলুন দেখি, কিভাবে সত্য হচ্ছে
আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা।

এম্যারিকান অর্থনীতির পতন

অনলাইনে দেখুন,

[https://www.youtube.com/watch?v=SfOHQ-
dy9wk](https://www.youtube.com/watch?v=SfOHQ-dy9wk)

ডাউনলোড করুন

হাই কোয়ালিটি (২৯.৫ এমবি)

[https://my.pcloud.com/publink/show?c...gyv1c6
3m29PNPk](https://my.pcloud.com/publink/show?c...gyv1c6
3m29PNPk)

লো কোয়ালিটি (৮.৩৭ এমবি)

[https://my.pcloud.com/publink/show?c...MP52v
QOHm1o5ak](https://my.pcloud.com/publink/show?c...MP52v
QOHm1o5ak)

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

অনলাইনে দেখুন,

<https://www.youtube.com/watch?v=dEKlFJpCQV>

০

ডাউনলোড করুন

হাই কোয়ালিটি

<https://my.pcloud.com/publink/show?c...0ub0FA>

N48I2e5y

লো কোয়ালিটি

<https://my.pcloud.com/publink/show?c...nxOwu>

xlBSsG4Dk

দারিদ্রের দুঃসংক্রমণ

গরীব দেশগুলোর দালাল শাসকদের মাধ্যমে ধনী দেশগুলো
কিভাবে তাদের উপর অর্থনৈতিক শোষণ করছে, নব্য
উপনিবেশবাদের মাধ্যমে কিভাবে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো
গরীব রাষ্ট্রগুলোর সম্পদ হাতিয়ে নিচ্ছে, এ ব্যাপারে নির্মিত
দুটি গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টারী ভিডিও

অনলাইনে দেখুন,

<https://www.youtube.com/watch?v=1BEpVjG->

rCY

ডাউনলোড করুন

হাই কোয়ালিটি

<https://my.pcloud.com/publink/show?c...kvkRA>

GEbzxRS9V

লো কোয়ালিটি

<https://my.pcloud.com/publink/show?c...x8v5u0>

HB2bldTV

সম্পদের বৈষম্য

অনলাইনে দেখুন,

<https://www.youtube.com/watch?v=UbGt69BqH>

Uc

ডাউনলোড করুন

হাই কোয়ালিটি

<https://my.pcloud.com/publink/show?c...0ub0FA>

N48I2e5y

লো কোয়ালিটি

https://my.pcloud.com/publink/show?c...nxOwu_xlBSsG4Dk

আসলে #অনুসন্ধিৎসু এর সবগুলো ভিডিওই সুন্দর, ইচ্ছা করলে এই লিংক থেকে তাদের ভিডিওগুলো দেখতে পারেন,

https://www.youtube.com/channel/UCKR...KSj_oSQ/videos

৮.জিহাদ ও সীমান্তপ্রহরা হারামাইন শরীফাইনে ইবাদতের চেয়েও উত্তম। -ইবনে তাইমিয়াহ রহ.

سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - قدس الله روحه - : عن سكنى مكة والبيت المقدس والمدينة المنورة على نية العبادة والانقطاع إلى الله تعالى. والسكنى بدمياط وإسكندرية وطرابلس على نية الرباط: أيهم أفضل؟

فأجاب:

الحمد لله، بل المقام في تغور المسلمين كالتغور الشامية والمصرية أفضل من المجاورة في المساجد الثلاثة وما أعلم في هذا نزاعا بين أهل العلم وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة؛ وذلك لأن الربط من جنس الجهاد والمجاورة غايتها أن

تكون من جنس الحج؛ كما قال تعالى: أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ
وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ
آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ
دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (التوبة: 19)

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي
إيمان بالله ورسوله». قيل: ثم ماذا؟ قال: «: العمل أفضل؟ فقال
«الجهاد في سبيل الله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور».

{صحيح البخاري: 26 صحيح مسلم: 83}

وقد روى مسلم في صحيحه [1913] عن سلمان الفارسي: أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رباط يوم وليلة خير من صيام
شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله،
". وأجرى عليه رزقه، وأمن الفتان

وفي السنن عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

"رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من

المنازل". [سنن النسائي: 3169 سنن الترمذي: 1667 قال

الترمذي: هذا حديث حسن] وهذا قاله عثمان على منبر رسول

الله صلى الله عليه وسلم وذكر أنه قال لهم ذلك تبليغا للسنة.

[ففي رواية الترمذي (1667) عن أبي صالح، مولى عثمان

قال: سمعت عثمان وهو على المنبر يقول: إني كتمتكم حديثا
سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية تفرقكم عني،
]. ثم بدا لي أن أحدثكموه ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له

وقال أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر

قال الشيخ شعيب في 4603 : الأسود". [صحيح ابن حبان
تعليقه على صحيح ابن حبان (10/463) : إسناده صحيح
وفضائل الرباط والحرس في سبيل الله كثيرة لا تسعها هذه
الورقة. (28/ 5) والحمد لله أعلم. مجموع الفتاوى

ইবনে তাইমিয়াহ রহ. কে প্রশ্ন করা হয়, ইবাদতের নিয়তে
মক্কা, মদীনা ও বাইতুল মাকদিসে অবস্থান করা আর সীমান্ত
প্রহরার নিয়তে 'দিময়াত', 'ইস্কানদারিয়া' বা 'তরাবলিসে'
অবস্থান করা, এ দুটির মধ্যে কোনটি উত্তম।

উত্তরে তিনি বলেন:-

সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য। মিসর, শাম এবং
অন্যান্য মুসলিম ভূখণ্ডের সীমান্তে অবস্থান করা উল্লিখিত
তিন মসজিদের পাশে অবস্থান করা হতে উত্তম। এ ব্যাপারে
আলেমদের মাঝে কোন মতভেদ রয়েছে বলে আমি জানি
না। একাধিক ইমাম এ বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে বলেছেন।
কেননা সীমান্ত প্রহরাও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। আর উল্লিখিত
মসজিদসমূহের পাশে অবস্থান বেশির চেয়ে বেশি হাজার
শ্রেণীভুক্ত হবে। আর আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

“তোমরা কি হাজিদের পানি পান করানো এবং মসজিদে
হরাম আবাদ করাকে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ইমান

আনা এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করার সমতুল্য মনে করো? আল্লাহর তায়ালায় নিকট তারা সমান হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা জালেম সম্প্রদায়কে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছান না। যারা ইমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জানমাল দিয়ে জিহাদ করেছে তারা আল্লাহর তায়ালায় নিকট মর্যাদার অনেক শ্রেষ্ঠ এবং তারাই সফলকাম।” [সূরা তাওবা, ১৯-২০]

সহিহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো, সর্বোত্তম আমল কোনটি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ইমান আনা। প্রশ্ন করা হলো, এরপর কোনটি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। প্রশ্ন করা হলো, এরপর কোনটি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হজ্জে মাবরুর (মকবুল হজ্জ)।” [সহিহ বুখারী, ২৬ সহিহ মুসলিম, ৮৩]

ইমাম মুসলিম সালমান ফার্সী রাযি. হতে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “একদিন ও একরাতের সীমান্ত প্রহরা একমাস (লাগাতর) রোযা রাখা এবং ইবাদতে রাত জাগা হতেও উত্তম। যদি এ অবস্থায়

তার মৃত্যু ঘটে, তবে সে যে আমলগুলো করতো তার সওয়াব জারী থাকে। তার রিযিক জারী করে দেয়া হয় এবং সে কবরে প্রশ্নকারী ও শাস্তিপ্রদানকারী (ফেরেশতাদের) থেকে নিরাপদ থাকে।” [সহিহ মুসলিম, ১৯১৩]

সুনানগ্রন্থসমূহে এসেছে, উসমান রাযি. এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “একদিন আল্লাহর রাস্তায় সীমান্তপ্রহরা একহাজার দিন ঘরে অবস্থান করে (ইবাদত করার) চেয়ে উত্তম।” [সুনানে নাসায়ী, ৩১৬৯ সুনানে তিরমিযি, ১৬৬৭ ইমাম তিরমিযি হাদিসটিকে হাসান বলেছেন]

উসমান রাযি. এ কথাটি বলেন, মসজিদে নববীর মিম্বরে বসে এবং তিনি উল্লেখ করেন যে, [সাহাবীরা তাকে ছেড়ে সীমান্ত প্রহরায় চলে যাবে এই ভয়ে তিনি এতদিন হাদিসটি বলেননি। আর এখন তিনি] উম্মাহর নিকট হাদিসটি পৌঁছে দেয়ার জন্য বর্ণনা করছেন। [সুনানে তিরমিযি, ১৬৭৭ এ থেকে বুঝে আসে, হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী জিহাদ ও সীমান্তপ্রহরা ইবাদত-বন্দেগীর জন্য মদীনায় অবস্থান করার চাইতেও উত্তম। এজন্যই তো উসমান রাযি. ভয় করেছেন, সাহাবীরা এ হাদিস শুনে তাকে মদীনায় একা রেখে

সীমান্তপ্রহরায় চলে যাবে আর তিনি পরামর্শ ও রাষ্ট্রীয় কাজে সহায়তার জন্য তাঁদের কাউকে পাবেননা।]

আবু হুরাইরা রাযি. [সীমান্ত প্রহরারত অবস্থায় বলেন], আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহর রাস্তায় একমুহর্ত অবস্থান করা শবে কদরে হজরে আসওয়াদের নিকট সারারাত ইবাদত করার চাইতে উত্তম। [সহিহ ইবনে হিব্বান, ৪৬০৩ শায়েখ শুয়াইব আরনাউত সহিহ ইবনে হিব্বানের টীকায় হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন] আসলে সীমান্তপ্রহরার ফযীলত অনেক, যা এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। মাজমুউল ফাতাওয়া, ৫/২৮

উল্লেখ্য, বন্ধনীর মাঝের কথাগুলো আমার। আশা করি উপরোক্ত আলোচনা হতে পাঠকের নিকট এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকবে না যে, নফল হজ-উমরা এবং হারামাইন শরিফে ইবাদত-ইতেকাফ ইত্যাদির চাইতে জিহাদ ও সীমান্তপ্রহরা উত্তম। কিন্তু আফসোস, কিছু সূফী যাহেদগণ (আল্লাহ তাদের ক্ষমা করুন) এ বিষয়টি মানতে নারাজ। তাঁরা কিছু দুর্বল যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে এর বিপরীত সাব্যস্ত করতে চান। যেমন উপরোক্ত আয়াতে যে জিহাদকে মসজিদে হারাম আবাদ করার চাইতে উত্তম বলা হয়েছে, তো মুফতী শফি রহ. কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী রহ. (মৃত্যু:

১২২৫ হি.) রচিত ‘তফসীরে মাযহারী’র সূত্রে বলেন,
 “আয়াতে মসজিদে হারাম আবাদ করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো,
 মসজিদের নির্মাণ ও মেরামত করা। এর চেয়ে জিহাদ
 উত্তম। কিন্তু ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে মসজিদে হারাম
 আবাদ করা জিহাদের চেয়ে উত্তম।” -মাআরেফুল কুরআন,
 ৪/৩৩৫

অথচ ইমাম জাসসাস সুস্পষ্টরূপে বলেছেন, ‘আবাদ করা
 দ্বারা’ উভয় প্রকার আবাদ করাই উদ্দেশ্য এবং এ ব্যাখ্যার
 স্বপক্ষে তিনি নিম্নোক্ত হাদিস পেশ করেছেন,

عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا
 رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله تعالى
 يقول: {إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام
 رواه الترمذي: 2617 وقال: هذا (هذا). الصلاة وآتى الزكاة} الآية
 (حديث غريب حسن).

যখন তোমরা কোন ব্যক্তিকে নিয়মিত মসজিদে আসতে
 দেখো, তখন তার মুমিন হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান
 করো। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ‘মসজিদ তো
 তারাই আবাদ করে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি
 ইমান আনয়ন করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান
 করে।’ (সূরা তাওবা ১৭) -সুনানে তিরমিযি, ২৬১৭ ইমাম

তিরমিযি হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।(দেখুন, আহকামুল
কুরআন, ইমাম জাসসাস, ১/৭৫ দারু ইহয়াউত তুরাস, সাদী
রহ. একই ব্যাখ্যা করেছেন, দেখুন, তাফসীরে সা'দী, পৃ:
৩৩১ মুয়াসসাসাতুল রিসালা)

তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রমাণস্বরূপ যে
আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন তা আমাদের আলোচ্য
আয়াতের পূর্বের আয়াত। আর হাদিস থেকে বুঝে আসে যে,
পূর্বের আয়াতে 'মসজিদ আবাদ করা'র দ্বারা তাতে ইবাদত
বন্দেগী করাও উদ্দেশ্য। তো পরের আয়াতেও মসজিদ
আবাদ করার একই অর্থ হবে এটাই স্বাভাবিক।

তাছাড়া আয়াতে 'মসজিদ আবাদ করা'র ব্যাখ্যা যাই হোক,
মসজিদুল হারামে ইবাদত করা তো নফল। আর জিহাদ
হলো ফরয। ফরযের সাথে নফলের তো কোন তুলনাই চলে
না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত
হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه

“বান্দা এমন কোন ইবাদতের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হয়
না, যা আমার নিকট ফরয ইবাদতসমূহের চাইতে বেশি
প্রিয়।” -সহিহ বুখারী, ৬৫০২

হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ.
বলেন,

أن القرب في الفرائض أزيد وأكمل، فإنه يجلب المحبوبة له
تعالى من أول الأمر. بخلاف القرب في النوافل، فإنها تجلب
المحبوبة تدريجا وإن كانت ثمرتها في الانتهاء أيضا هي
المحبوبة. ولكن ما يحصل من النوافل آخرا يحصل من
(6/ 270) الفرائض أولا، (فيض الباري على صحيح البخاري

“ফরয ইবাদতে নফলের তুলনায় আল্লাহর নৈকট্য বেশি হয়।
কেননা ফরয ইবাদতের মাধ্যমে শুরুতেই আল্লাহর তায়ালার
নৈকট্য লাভ হয়। পক্ষান্তরে নফল ইবাদতে ধীরে ধীরে
আল্লাহর তায়ালার নৈকট্য লাভ হয়। যদিও উভয়টির
মাধ্যমেই নৈকট্য লাভ হয়, তবে নফলের দ্বারা শেষে যা
অর্জিত হয় ফরযের দ্বারা শুরুতেই তা অর্জিত হয়।” -
ফয়জুল বারী, ৬/২৭০

আল্লামা তাকী উসমানী দা.বা. বলেন,

(উপরোক্ত) আয়াতে মূলনীতি বলে দেয়া হয়েছে যে, সমস্ত
নেক কাজ সম-মর্যাদার হয় না। ... নিশ্চয়ই হাজীদেরকে
পানি পান করানো একটি মহৎ কাজ, কিন্তু মর্যাদা হিসেবে

তা নফল বৈ নয়। অনুরূপ মসজিদুল হারামের তত্ত্বাবধানও অবস্থাভেদে ফরযে কিফায়া কিংবা একটি নফল ইবাদত। পক্ষান্তরে ঈমান তো মানুষের মুক্তির জন্য বুনিয়াদী শর্ত। আর জিহাদ কখনো ফরযে আইন এবং কখনোও ফরযে কিফায়া। প্রথমোক্ত কাজ দু'টির তুলনায় এ দু'টোর মর্যাদা অনেক উপরে।” -তাওয়ীছুল কুরআন, ১/৫২৮

আসলে সূফী সাধকগণের সমস্যা অন্য জায়গায়, তারা যেহেতু যিকিরকেই প্রাধান্য দিতে চান তাই আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা করতে বাধ্য হন। এজন্যই উল্লিখিত আয়াতের তাফসীরে তাঁরা তিরমিযির একটি হাদিস এনে যিকিরকে জিহাদের চেয়ে উত্তম প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাদের মাথায় সাধারণ এ কথাটা খেলে না যে, যিকির ও জিহাদের মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই। সূফীগণ যে যিকিরগুলো করেন তা জিহাদের ময়দানে গিয়েও করা যায়। আর আল্লাহ তায়ালা তো যুদ্ধ চলাকালীন কঠিন মুহুর্তেও যিকিরের নির্দেশ দিয়েছেন এবং একে বিজয়ের কারণরূপে চিহ্নিত করেছেন। -সূরা আনফাল, ৪৫

তাছাড়া যিকিরের ফযিলত বর্ণনা করবেন যেসব আয়াতে যিকিরের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে তার তাফসীরে। আলোচ্য আয়াত দ্বারা তো আল্লাহ তায়ালা উদ্দেশ্য জিহাদের প্রতি

উদ্বুদ্ধ করা। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় যিকিরকে জিহাদের চেয়ে উত্তম প্রমাণের চেষ্টার দ্বারা তো প্রকারান্তরে জিহাদের প্রতি নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। এটা কি আল্লাহ তায়ালায় উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হয়ে যাচ্ছে না? এটা কি তাফসীর না তাহরীফ? আল্লাহ আমাদের হক বুঝার ও তা গ্রহণ করার তাওফিক দান করুন। প্রান্তিকতা মুক্ত হয়ে শরিয়তের প্রতিটি আমলকে যথাযথ মর্যাদা দান করার তাওফিক দান করুন।

৯.জিহাদী তানযীম গঠনের ব্যাপারে সংশয়ের জবাব;
ভূযাইফা রাযি. এর হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা

জিহাদের জন্য দল গঠন করা, সৎ কাজে একে অপরকে সাহায্য করার অন্তর্ভুক্ত, যার নির্দেশ কুরআন-সুন্নাহ আমাদেরকে দিয়েছে। মক্কার কিছু লোক মাজলুমকে সাহায্য করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ইত্যাদি সৎ কাজের জন্য দল গঠন করেছিল। ইতিহাসে যা হিলফুল ফুযুল বা হিলফুল মুতাইয়াবিন নামে প্রসিদ্ধ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে তাতে অংশগ্রহণ করেছেন এবং রাসুল বলেছেন, যদি ইসলামের যমানায়ও আমাকে এমন কোন চুক্তির দিকে আহ্বান জানানো হয়,

তবে আমি তাতে সাড়া দিবো। -দেখুন, মুসনাদে আহমদ, ১৬৫৫ ফাতহুল বারী, ৪/৪৭৩ দারুল ফিকর। যাই হোক, এ বিষয়ে বিস্তারিত দলিলাদি পূর্বেও সহ লেখা হয়েছে, আমি সেগুলোর লিংক প্রবন্ধের শেষে দিয়ে দিবো ইনশাআল্লাহ।

আমার আজকের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হলো, যারা জিহাদের জন্য তানযীম গঠনকে নাজায়েয বলেন, তাদের সংশয় নিরসন করা। যারা এ সংশয় ছড়ান তারা নিম্নোক্ত হাদিস দিয়ে দলিল দেয়ার চেষ্টা করেন,

عن حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانَ يَقُولُ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٌّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ قُلْتُ وَمَا دَخَنُهُ قَالَ قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هُدًىي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ قُلْتُ فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ دُعَاءٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا قَالَ هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِالسِّنِّيَّتَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ قَالَ تَلْزِمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفُرُقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعْضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ.

“হুযাইফাহ ইবনু ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কল্যাণের বিষয়াবলী জিজ্ঞেস করত। কিন্তু

আমি তাঁকে অকল্যাণের বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম এ ভয়ে যে, অকল্যাণ আমাকে পেয়ে না বসে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো জাহিলিয়াত ও অকল্যাণের মাঝে ছিলাম। এরপর আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এ কল্যাণের মধ্যে নিয়ে আসলেন। এ কল্যাণের পর আবারও কি অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে এর মধ্যে কিছুটা অসচ্ছতা থাকবে। আমি প্রশ্ন করলাম, সেই অসচ্ছতা কিরূপ? তিনি বললেন, একটা জামাত আমার তরীকা ছেড়ে লোকদেরকে অন্য পথে পরিচালিত করবে। তাদের থেকে ভাল কাজও দেখবে এবং মন্দ কাজও দেখবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সে কল্যাণের পর কি আবার অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে। যে ব্যক্তি তাদের আহ্বানে সাড়া দেবে, তাকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ছাড়বে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের নিকট তাদের বিবরণ প্রদান করুন (যেন আমরা তাদেরকে চিনতে পারি)। তিনি বললেন, তারা আমাদের লোকই এবং আমাদের ভাষায়ই কথা বলবে। আমি বললাম, যদি আমি সেই যমানা পাই তবে আমি কি করবো? তিনি বললেন, মুসলিমদের জামাত ও তাদের ইমামকে আঁকড়ে থাকবে। আমি আরজ করলাম, যদি তখন মুসলিমদের কোন জামাত ও ইমাম না থাকে? তিনি বললেন, তাহলে তুমি তখন ঐ

সকল দল পরিত্যাগ করে আলাদা হয়ে যাবে। এ কারণে যদি কোন গাছের শিকড় কামড়িয়ে পড়ে থাকতে হয়- তাহলেও। যতক্ষণ না সে (বিচ্ছিন্ন) অবস্থায় তোমার মৃত্যু উপস্থিত হয়।” - সহিহ বুখারী, কিতাবুল ফিতান, হাদিস নং ৬৬৭৩

তারা এ হাদিসের ভিত্তিতে দাবী করেন, মুসলমানদের যখন ইমাম থাকবে না, তখন জিহাদের জন্য কোন দল বা তানযীম গঠন করা যাবে না, বরং সব দল থেকে পৃথক থাকতে হবে। কিন্তু এ কথাটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং তা হাদিসের মনগড়া ব্যাখ্যা।

হাদিসে যে মুসলমানদের জামাত এবং ইমামের কথা বলা হয়েছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ইমামুল মুসলিমিন এবং মুসলমানদের জামাত যারা তার হাতে বাইয়াত হয়েছেন। হাদিসের উদ্দেশ্য হলো, যদি মুসলমানগণ ঐক্যবদ্ধভাবে কাউকে ইমাম হিসেবে মেনে নেয়, তবে সকলের জন্য উচিত তার আনুগত্য করা, তার বিপক্ষে বিদ্রোহ না করা। যদিও তার মাঝে কিছু ফিসক, জুলুম-অত্যাচার বা অন্য কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে, যতক্ষণ না তা সুস্পষ্ট কুফরের সীমায় পৌঁছে যায়। আর যদি মুসলমানদের কোন একক ইমাম না থাকে, বরং তারা শুধু রাজত্বের লোভে পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হয়, তাহলে মুসলমানদের জন্য আবশ্যিক হলো, এই

হানাহানিতে না জড়ানো, বরং সবগুলো দল থেকে পৃথক থাকার। সহিহ মুসলিমের বর্ণনা হতে বিষয়টি একেবারেই সুস্পষ্ট এবং হাদিসের ব্যাখ্যাদাতা মুহাদ্দিস ও ফকিহগণও বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে বলেছেন

সহিহ মুসলিমে আবু সাল্লাম রহ. এর সূত্রে হুযাইফা রাযি.
এর হাদিসটি এভাবে এসেছে,

يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي،
وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس»،
قلت: كيف أصنع يا رسول الله، إن أدركت ذلك؟ قال: قال: «تسمع
وتطيع للأمر، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك، فاسمع
وأطع» صحيح مسلم (3/ 1476 رقم الحديث 1847 ت مفؤاد
عبد الباقي ط: دار إحياء التراث العربي)

“আমার পরে এমন শাসকরা আসবে যারা আমার আদর্শের
অনুসরণ করবে না, আমার সুন্নাহ অনুযায়ী চলবে না।
তাদের মাঝে এমন কিছু লোকও থাকবে যারা হবে
মানুষরূপী শয়তান। (হুযাইফা রাযি. বলেন,) আমি বললাম,
হে আল্লাহর রাসূল, যদি আমি সেই যমানা পাই তবে তখন
আমার করণীয় কি? রাসূল বললেন, তুমি আমিরের আনুগত্য
করবে, যদিও সে তোমার পিঠে আঘাত করে এবং তোমার
ধন-সম্পদ কেড়ে নেয়, তবুও তুমি তার আনুগত্য করো।” -
সহিহ মুসলিম, ১৮৪৭

ইমাম বুখারী হাদিসটির শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

بَابُ كَيْفَ الْأَمْرِ إِذَا لَمْ تَكُنْ جَمَاعَةً

“জামাত না থাকলে কি করণীয়”। -সহিহ বুখারী, ৯/৫১

হাফেয ইবনে হাজার রহ. সহিহ বুখারীর বিখ্যাত ভাষ্যগ্রন্থ ফাতহুল বারীতে এই শিরোনামের ব্যাখ্যায় বলেন,

والمعنى ما الذي يفعل المسلم في حال الاختلاف من قبل ألا يقع الاجتماع على خليفة. (فتح الباري 23/70 ت شعيب الأرنؤوط
(ط. الرسالة العالمية

“অর্থাৎ একজন খলিফার ব্যাপারে সকলে একমত হওয়ার পূর্বে তাদের মধ্যে পরস্পর হানাহানির সময়ে একজন মুসলিমের করণীয় কি? -ফাতহুল বারী, ২৩/৭০ শুয়াইব আরনাউত রহ. এর তাককিককৃত *নুসখা।

হাদিসের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনে হাজার রহ. আরো বলেন,

قال الطبري: والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة، قال: وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن

استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر، وعلى ذلك ينتزل ما جاء في سائر الأحاديث، وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف منها، ويؤيده رواية عبد الرحمن بن قرط المتقدم ذكرها (فتح الباري 23/71 ت شعيب الأرنؤوط ط. الرسالة العالمية)

“ইমাম তবারী রহ. বলেন, হাদিসের উদ্দেশ্য হলো, ঐ দলকে আঁকড়ে ধরা যারা সম্মিলিতভাবে কাউকে আমির হিসেবে মেনে নেয়। সুতরাং যদি কেউ তার বাইয়াত ভঙ্গ করে তবে সে জামাত হতে বের হয়ে যাবে। হাদিস থেকে বুঝে আসে, যদি মুসলমানদের কোন একক ইমাম-শাসক না থাকে এবং মানুষ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যায়, তবে বিভক্তি ও হানাহানির সময় কোন দলের অনুসরণ করা যাবে না। বরং মন্দ হতে বাঁচার জন্য সেই সবগুলো দল থেকে পৃথক থাকতে হবে।” -ফাতহুল বারী, ২৩/৭১ শুয়াইব আরনাউত রহ. এর তাককিককৃত *নুসখা।

‘ دُعَاةٌ عَلَىٰ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قُدُّوهُ فِيهَا ’ জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী কিছু লোকের উদ্ভব ঘটবে। যে ব্যক্তি তাদের আহ্বানে সাড়া দেবে, তাকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ছাড়বে।’ হাদিসের এ অংশের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন,

والذي يظهر أن المراد بالدعاة على أبواب جهنم من قام في طلب الملك من الخوارج وغيرهم، وإلى ذلك الإشارة بقوله

الزم جماعة المسلمين وإمامهم " يعني ولو جار ويوضح ذلك " ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك " وكان مثل " :رواية أبي سلام ذلك كثيرا في إمارة الحجاج ونحوه. (فتح الباري 23/71 ت (شعيب الأرنؤوط ط. الرسالة العالمية

“জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী কিছু লোক’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, খারেজী ও অন্যান্য যারা রাজত্ব লাভের জন্য যুদ্ধ করেছে। হাদিসে ‘তুমি মুসলমানদের জামাত ও তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে’ বলে এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ যদিও ইমাম জুলুম-অত্যাচার করে, এ বিষয়টি আবু সাল্লাম এর বর্ণনা হতে স্পষ্ট হয়, তাতে এসেছে, ‘যদিও সে তোমার পিঠে বেত্রাঘাত করে এবং তোমার সম্পদ কেড়ে নেয়’। হাজ্জাজ ও তার মত অনেক শাসক এরকম জুলুম-অত্যাচার করতো। -ফাতহুল বারী, ২৩/৭১ শুয়াইব আরনাউত রহ. এর তাককিককৃত *নুসখা।

আর হাদিসে যে সব দল থেকে পৃথক থাকার কথা বলা হয়েছে এটা শুধু তখনই যখন মুসলমানদের সবগুলো দলই শুধু রাজত্বের লোভে পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হয়। একেই অন্যান্য হাদিসে ফিতনা বলা হয়েছে এবং এ সময় পাহাড়-পর্বতে পালিয়ে যেতে কিংবা তরবারী ভেঙ্গে ঘরে বসে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন এক হাদিসে এসেছে,

ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من «
 الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها
 تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذاً فليعد به». صحيح البخاري
 (2886) صحيح مسلم (3601)

“অচিরেই ফিতনা আসবে, যে সময় বসে থাকা ব্যক্তি দাড়িয়ে
 থাকা ব্যক্তি হতে উত্তম হবে। দন্ডায়মান ব্যক্তি হাটতে থাকা
 ব্যক্তি থেকে উত্তম হবে আর হাটতে থাকা ব্যক্তি দৌড়াতে
 থাকা ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে। যে এ ফিতনার দিকে চোখ
 তুলে তাকাবে ফিতনা তাকে নিজের দিকে টেনে নিবে। যে
 (এ থেকে পরিত্রানের জন্য) কোন আশ্রয়স্থল পায় সে যেন
 তাতে আশ্রয় নেয়। -সহিহ বুখারী, ৩৬০১ সহিহ মুসলিম,
 ২৮৮৬

উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনে হাজার রহিমাল্লাহ
 বলেন,

والمراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك حيث لا
 يعلم المحق من المبطل... قال الطبري: والصواب أن يقال إن
 الفتنة أصلها الابتلاء، وإنكار المنكر واجب على كل من قدر
 عليه، فمن أعان المحق أصاب ومن أعان المخطئ أخطأ، وإن
 أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها. (فتح
 الباري: 23/61 ت شعيب الأرنؤوط)

“ফিতনা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, রাজত্ব লাভের জন্য মুসলমানদের পরস্পর যুদ্ধ, যেখানে কোন দল হক আর কোন দল বাতিল তা বুঝা যায় না।... ইমাম তবারী বলেন, এ ব্যাপারে সঠিক মত হলো, ফিতনার আসল অর্থ পরীক্ষা, আর প্রত্যেক সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর বাতিলের প্রতিরোধ করা ওয়াজিব, সুতরাং যে হকের অনুসারীর সাহায্য করবে সে সঠিক কাজ করলো, আর যে বাতিলের সাহায্য করল সে ভুল করলো, আর যদি হক-বাতিল অস্পষ্ট হয়ে যায় তাহলে এই অবস্থায় যুদ্ধ করার ব্যাপারেই হাদিসে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। -ফাতহুল বারী, ১৩/৩১

পক্ষান্তরে যদি একপক্ষ হক হয় আর অপক্ষ পক্ষ বাতিল, একপক্ষ দ্বীন কায়েম করার জন্য যুদ্ধ করে, অপরপক্ষ গণতন্ত্র ও মানবরচিত বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে তখন হক দলকে সাহায্য করা ওয়াজিব। ইমাম নববী রহ. বলেন,

وقال معظم الصحابة والتابعين وعامة علماء الإسلام: يجب نصر المحق في الفتن والقيام معه بمقاتلة الباغين كما قال تعالى {فقاتلوا التي تبغي} الآية. وهذا هو الصحيح وتناول الأحاديث على من لم يظهر له المحق أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحد منهما. (شرح مسلم للنووي: 18/10 ط. دار إحياء التراث)

“অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও আলেমদের মতে ফিতনার সময় হকের অনুসারীকে সাহায্য করা এবং তার সাথে মিলে সীমালঙ্ঘনকারীদের বিপক্ষে যুদ্ধ করা ওয়াজিব, কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ‘তোমরা সীমালঙ্ঘন কারীদের বিপক্ষে যুদ্ধ করো’, এটাই সহিহ মত, আর ফিতনার সময় যেসব হাদিসে যুদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়েছে সেগুলো ঐ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যাদের নিকট কোন পক্ষ হক তা স্পষ্ট নয়, কিংবা যখন উভয় পক্ষই জালেম (ও রাজত্বলোভী) হয়, (যুদ্ধের জন্য) তাদের কোন তাবীল ও শরিয়তসম্মত কারণ না থাকে। -শরহে মুসলিম, ১৮/১০

আলী রাযিআল্লাহু আনহু তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের সাথে যুদ্ধ করেছেন, এবং সহিহ হাদিসের আলোকে ও সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের মতে তিনিই হকের *উপর ছিলেন, তিনি বিদ্রোহীদের বিপক্ষে যুদ্ধ করাকে ফিতনা মনে করেননি, অথচ তখন মুসলমানদের একক আমীর ছিল না। শামের লোকেরা আলী রাযি. এর নিকট বাইয়াত দেননি।

তেমনিভাবে আলী রাযি. এর বিপক্ষে যারা যুদ্ধ করেছেন তারাও এই যুদ্ধকে হক মনে করেই করেছেন, ফিতনা মনে

করেননি। অন্যান্য সাহাবীদের অধিকাংশই কোন এক পক্ষ অবলম্বন করেছেন, যাদের কাছে আলী রাযিআল্লাহু আনহুকে হক মনে হয়েছে তারা আলী রাযিআল্লাহু আনহুর দলে যোগ দিয়েছেন, আর যাদের কাছে আলীর বিরোধীদের হক মনে হয়েছে তারা বিরোধীদের দলে যোগ দিয়েছেন। তারা কেউ হুযাইফা রাযি। এর হাদিসের এ অর্থ বুঝেননি যে, মুসলমানদের একক শাসক না থাকলে পৃথক হয়ে বসে থাকতে হবে, হক দলকেও সাহায্য করা যাবে না।

বরং হাদিসের বর্ণনাকারী হুযাইফা রাযি। নিজেই আলী রাযি। এর পক্ষে যুদ্ধ করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। তাহলে তার বর্ণিত হাদিসের ভিত্তিতে কিভাবে এ কথা বলা সম্ভব যে, মুসলমানদের একক আর্মীর না থাকলে সব দল থেকে পৃথক হয়ে থাকতে হবে, হক দলকেও সাহায্য করা যাবে না? হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন,

بايع لعلي وحرص على المبايعة له والقيام فيه نصره، ومات في أوائل خلافته (فتح الباري: 23/79 ت شعيب الأرنؤوط)

“হুযাইফা রাযি। আলী রাযি। এর হাতে বাইয়াত হন। তার নিকট বাইয়াত হওয়া এবং তাকে সাহায্য করার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি আলী রাযি। এর খেলাফতের শুরুর দিকে ইত্তিকাল করেন।” -ফাতহুল বারী, ২৩/৭৯

হাঁ, কিছু সাহাবী কোনপক্ষই অবলম্বন করেননি, উলামায়ে
কেরাম বলেছেন, তাদের কাছে কোন পক্ষ হক তা স্পষ্ট
হয়নি, তাই তারা কোনো পক্ষ অবলম্বন হতে বিরত
রয়েছেন। ইমাম নববী রহ. বলেন,

واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم ليست
بداخلة في هذا الوعيد، ومذهب أهل السنة والحق؛ إحصان الظن
بهم، والإمساك عما شجر بينهم، وتأويل قتالهم، وأنهم مجتهدون
متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا، بل اعتقد كل
فريق أنه المحق ومخالفه باغ، فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر
الله، وكان بعضهم مصيباً وبعضهم مخطئاً معذوراً في الخطأ،
لأنه اجتهد، والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه، وكان علي رضي
الله عنه هو المحق المصيب في تلك الحروب، هذا مذهب أهل
السنة، وكانت القضايا مشتبهة حتى إن جماعة من الصحابة
تحيروا فيها، فاعتزلوا الطائفتين، ولم يقاتلوا، ولم يتيقنوا
الصواب، ثم تأخروا عن مساعدته منهم. (شرح مسلم للنووي:
18/11 ط. دار إحياء التراث)

“সাহাবীদের মধ্যে যে রক্তপাত হয়েছে তা হাদিসে বর্ণিত
ধমকী ‘দুই মুসলমান যুদ্ধ করলে হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি
উভয়েই জাহান্নামে যাবে’ এর আওতাভুক্ত নয়। আহলুস
সুন্নাহ ও জামাআর মাযহাব হলো সাহাবীদের ব্যাপারে
সুধারণা পোষণ করা, তাদের পরস্পর মতানৈক্য নিয়ে
(সমালোচনা) থেকে বিরত থাকা এবং তাদের যুদ্ধের তাবীল

বা শরিয়তসম্মত কারণ বর্ণনা করা এবং এ কথা বলা যে তারা দুনিয়াবী (রাজত্বের লোভে) যুদ্ধ করেননি। বরং তারা ইজতেহাদ করেছেন, এবং প্রত্যেক দল এই বিশ্বাস করেছেন যে তারাই হক এবং তাদের বিরোধীরা হলো সীমালঙ্ঘনকারী, সুতরাং তাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করা ওয়াজিব, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর বিধানের দিকে ফিরে আসে। তাদের কারো ইজতেহাদ সঠিক ছিল, আরো কারো ইজতেহাদ ভুল। আর ইজতেহাদী ভুলের কারণে মুজতাহিদের কোন গুনাহ হয় না। আহলুস সুন্নাহর মতে এই যুদ্ধগুলোতে আলী রাযিআল্লাহু আনহুই হকের উপর ছিলেন, কিন্তু বিষয়গুলো গোলমালে ছিল, এমনকি সাহাবীদের একটি দলও কারা হক তা অনুধাবণ করতে পারেননি। তাই তারা কোন পক্ষ অবলম্বন থেকে বিরত থেকেছেন।” -শরহে মুসলিম, ১৮/১১

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য নিচের লিংকগুলো দেখা যেতে পারে,

<https://dawahilallah.com/showthread....B%26%232482%3B>

<https://dawahilallah.com/showthread....%26%232467%3B>

<https://dawahilallah.com/showthread...B%26%232478%3B>

১০.জিহাদে অনুৎসাহিত করা মুনাফিকদের সিফাত

আল্লাহ তায়ালা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ করেছেন মুমিনদের জিহাদে উদ্বুদ্ধ করতে। ইরশাদ হয়েছে,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ

‘হে নবী! মুমিনদের যুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধ করো। -সুরা আনফাল: ৬৫

অপর আয়াতে বলা হয়েছে, দুটি কাজ করলে আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের শক্তি শেষ করে দিবেন,

ক. নিজে জিহাদ করা।

খ. মুমিনদের জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। কারণ জিহাদ একটি সংঘবদ্ধ কাজ। একা একা জিহাদ করা সম্ভব না, এজন্য একটি বাহিনী দরকার। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى
اللَّهُ أَنْ يَكْفِيَ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا

‘সুতরাং (হে নবী!) তুমি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো। তোমার উপর তোমার নিজের ছাড়া অন্য কারোও দায়ভার নেই। অবশ্য মুমিনদেরকে উৎসাহ দিতে থাকো। অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ কাফিরদের যুদ্ধ ক্ষমতা চূর্ণ করে দিবেন। আল্লাহর শক্তি সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড এবং তার শাস্তি অতি কঠোর।’ -সূরা নিসা: ৮৪

তাই নবীর অনুসারীদের বিশেষকরে নবীর ওয়ারিশ আলেমগণের দায়িত্ব হলো মুমিনদের জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। কিন্তু বর্তমানে দুঃখজনকভাবে সাধারণ মুসলিমদের পাশাপাশি আলেমগণও বিভিন্নভাবে জিহাদের প্রতি মুমিনদের নিরুৎসাহিত করছেন। নানা মনগড়া শর্ত আরোপ করে জিহাদের পথে বাঁধা সৃষ্টি করছেন। অথচ জিহাদে বাঁধা দেয়া, জিহাদের প্রতি নিরুৎসাহিত করা তো মুনাফিকদের সিফাত, যা আলেম তো দূরের কথা একজন সাধারণ মুসলমানের মাঝেও না থাকা কাম্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ
الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ

‘আল্লাহ তাদেরকে ভালো করেই জানেন, তোমাদের মধ্যে

যারা (জিহাদে) বাধা সৃষ্টি করে এবং নিজ ভাইদেরকে বলে,
আমাদের কাছে চলে এসো। আর তারা নিজেরা তো যুদ্ধে
আসেই না; আসলেও তা অতি সামান্য। (এবং তাও
তোমাদের গনিমতের) প্রতি লালায়িত হয়ে।’ -সূরা আহযাব:
১৮-১৯

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبْتَغَىٰ فَرَأَىٰ مِنْهُ خَالِفًا بِمَا جَاءَهُ مِنَ الْمَوَدَّةِ الْكَافِرِينَ أُولَٰئِكَ جُنُودٌ لَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جُنُودٌ عَلَيْهِمْ سَبِيحًا فَغَالِبًا ۗ
وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبْتَغَىٰ فَرَأَىٰ مِنْهُ خَالِفًا بِمَا جَاءَهُ مِنَ الْمَوَدَّةِ الْكَافِرِينَ أُولَٰئِكَ جُنُودٌ لَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جُنُودٌ عَلَيْهِمْ سَبِيحًا فَغَالِبًا ۗ

‘নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে এমন কেউও থাকবে, যে নিজেও
(জিহাদে বের হতে) গড়িমসি করবে, অপরকেও
নিরুৎসাহিত করবে। তারপর (জিহাদ কালে) তোমাদের
কোনও মসিবত দেখা দিলে বলবে, আল্লাহ আমার উপর বড়
অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সাথে উপস্থিত ছিলাম
না। আর আল্লাহর পক্ষ হতে তোমরা কোন অনুগ্রহ (বিজয়
ও গনিমতের মাল) লাভ করলে সে বলবে -যেন তোমাদের
ও তার মধ্যে কখনোও কোন সম্প্রীতি ছিল না- ‘হায় যদি
আমিও তাদের সঙ্গে থাকতাম, তবে আমার ভাগ্যেও অনেক
কিছু জুটতো।’ -সূরা নিসা: ৭২-৭৩ তাফসীরে ইবনে কাসীর:
২/৩৫৭

অন্যত্র বলা হয়েছে,

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ
جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ

‘যাদেরকে (তাবুক যুদ্ধ হতে) পিছনে থাকতে দেয়া হয়েছিল, তারা রাসূলুল্লাহর যাওয়ার পর (নিজ গৃহে) বসে থাকাতে আনন্দ লাভ করলো। আর আল্লাহর পথে নিজেদের জান-মাল দ্বারা জিহাদ করা তাদের কাছে অপছন্দ ছিল। তারা বলেছিল, এই গরমে বের হয়ো না। বল, উত্তাপে জাহান্নামের আগুন তীব্রতর। যদি তারা বুঝতো!’ –সূরা তাওবা: ৮১

আরো ইরশাদ হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا
ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرَىٰ لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا
قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكُمْ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

‘হে মুমিনগণ! সেই সব লোকের মতো হয়ে যেও না, যারা কুফর অবলম্বন করেছে এবং তাদের ভাইয়েরা যখন কোনও দেশে সফর করে কিংবা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, তখন তাদের সম্পর্কে তারা বলে, তারা আমাদের সঙ্গে থাকলে মারা

যেতো না এবং নিহতও হতো না। (তাদের এ কথার)
 পরিণাম তো (কেবল) এই যে, এরূপ কথাকে আল্লাহ তাদের
 অন্তরের আক্ষেপে পরিণত করেন। (নচেৎ) জীবন ও মৃত্যু
 তো আল্লাহই দেন। আর তোমরা যে কর্মই করো, আল্লাহ তা
 দেখছেন।’ -সূরা আলে ইমরান: ১৫৬

আয়াতের তাফসীরে আল্লামা শানকিতি রহ. বলেন,

ذكر في هذه الآية الكريمة أن المنافقين إذا مات بعض إخوانهم
 يقولون: لو أطاعونا فلم يخرجوا إلى الغزو ما قتلوا، ولم يبين
 هنا هل يقولون لهم ذلك قبل السفر إلى الغزو ليثبطوهم أو لا؟
 ولكنه بين في آيات أخر أنهم يقولون لهم ذلك قبل الغزو ...
 وقالوا لا تنفروا في الحر الآية، وقوله: قد يعلم: ليثبطوهم كقوله
 الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، وقوله: وإن منكم
 لمن ليبطئن، إلى غير ذلك من الآيات. (أضواء البيان في
 إيضاح القرآن بالقرآن: 1/214)

‘এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, যখন মুনাফিকদের কোন
 ভাই মারা যায় তখন তারা বলে, তারা জিহাদে না যাওয়ার
 ব্যাপারে আমাদের কথা মানলে নিহত হতো না। তারা
 জিহাদে যাওয়ার পূর্বে তাদেরকে কি কথা বলতো, তা উক্ত
 আয়াতে উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু অন্যান্য আয়াতে স্পষ্ট
 করে দেয়া হয়েছে যে, তারা তাদেরকে জিহাদে যেতে বারণ

করতো। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে, ‘তারা বলেছিল, এই গরমে বের হয়ো না।’ অপর আয়াতে বলা হয়েছে, ‘আল্লাহ তাদেরকে ভালো করেই জানেন, তোমাদের মধ্যে যারা (জিহাদে) বাধা সৃষ্টি করে এবং নিজ ভাইদেরকে বলে, আমাদের কাছে চলে এসো।’ অন্যত্র বলা হয়েছে, ‘নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে এমন কেউও থাকবে, যে নিজেও (জিহাদে বের হতে) গড়িমসি করবে, অপরকেও নিরুৎসাহিত করবে।’
 -আযওয়াউল বয়ান: ১/২১৪

জঙ্গি আহযাবে যখন পুরো আরবের মুশরিকরা মদীনায হামলা করতে এসেছিল এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীরা খন্দক খোদাই করে তাদেরকে বাধা দিচ্ছেন, ইতোমধ্যে সংবাদ আসে, বনু কুরাইযা অঙ্গীকারভঙ্গ করে মুশরিকদের সাথে মিলিত হয়েছে, তখন মুনাফিকরা বলে *উঠে,

يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا

‘হে ইয়াসরিববাসী! (পুরো আরবের মোকাবেলায়) তোমাদের টিকে থাকার উপায় নেই। সুতরাং ফিরে চলে যাও।’ -সূরা আহযাব: ১৩; আততাহরীর ওয়ান তানভীর: ২১/২৮৪

এ আয়াত হতে বুঝে আসে, ‘কাফেরদের মোকাবেলার মত শক্তি আমাদের নেই’- এ কথা বলে জিহাদের প্রতি

নিরুৎসাহিত করাও মুনাফিকদের সিফাত। পক্ষান্তরে নবী ও তার ওয়ারিশদের সিফাত হলো, কাফেরদের শক্তিসামর্থ্য কে মুমিনদের দৃষ্টিতে হেয় করে তোলা। প্রবন্ধের শুরুতে সুরা আনফালের যে আয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুমিনদের জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছে, সেই আয়াতের পরের অংশে, নবী কি বলে মুমিনদের যুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধ করবেন, তাও বলে দেয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, মুমিনদের শক্তি-সংখ্যা কম হলেও আল্লাহ তায়ালার সাহায্যে তারা বিজয় লাভ করবেন। অথচ কি আশ্চর্য আজ আমরা কিছু নামধারী আলেমকে দেখছি, তারা ঠিক মুনাফিকদের মতোই কাফেরদের শক্তির ভয় দেখিয়ে আমাদেরকে জিহাদের প্রতি নিরুৎসাহিত করছেন! আয়াতের পরের অংশ দেখুন,

إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

‘তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন ধৈর্যশীল লোক থাকে, তবে তারা দুশো জনের উপর জয়ী হবে। তোমাদের মধ্যে যদি একশো জন থাকে, তবে তারা এক হাজার কাফেরের উপর জয়ী হবে। কেননা তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা বুঝ-সমঝ রাখে না। -আনফাল: ৬৬

আয়াতের তাফসীরে আল্লামা তাকী উসমানী দা.বা. বলেন,
'যেহেতু সঠিক বুঝ রাখে না তাই ইসলামও গ্রহণ করে না।
আর ইসলাম গ্রহণ না করার কারণে আল্লাহ তায়ালার
গায়েবী সাহায্য থেকে বঞ্চিত থাকে এবং নিজেদের দশগুণ
বেশি শক্তি থাকা সত্ত্বেও মুসলিমদের কাছে পরাস্ত হয়।' -
তাওযিহুল কুরআন: ১/৫১০

১১. জিহাদে দানের নিয়তে খতম তারাবীহর হাদিয়া গ্রহণ

জিহাদে দানের নিয়তে খতম তারাবীহর বিনিময় গ্রহণের
ব্যাপারে অনেক ভাই জানতে চেয়েছিলেন, ইলম ও জিহাদ
ভাই সংক্ষেপে সুন্দর উত্তরও দিয়েছেন, আমি এখানে কিছু
বিষয় উল্লেখ করতে চাচ্ছি, যা দ্বারা মাসয়ালাটি আরো স্পষ্ট
হবে ইনশাআল্লাহ,

এক. হারাম সম্পদ দান করার নিয়তেও গ্রহণ করা বৈধ
নয়; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

من جمع مالا حراما، ثم تصدق به، لم يكن له فيه أجر، وكان
إصره عليه. أخرجه ابن حبان في صحيحه: (3216) وقال
الشيخ شعيب: إسناده حسن ... وأخرجه الحاكم ... وصححه،
ووافقه الذهبي.

যে ব্যক্তি হারাম সম্পদ উপার্জন করে তা সদকা করলো, সে কোন সওয়াব পাবে না; বরং এর গুনাহ তার উপরই বর্তাবে। -সহীহ ইবনে হিব্বান, ৩২১৬ শায়েখ শুয়াইব আরনাউত বলেন, হাদিসটির সনদ হাসান পর্যায়ের, হাকেম রহিমাল্লাহু হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।

দুই. যেহেতু জিহাদ ও মুজাহিদদের বিপক্ষে উলামায়ে সূয়ের প্রপাগান্ডার সয়লাব চলছে, তাই আমাদের এমন সবকিছু হতে বিরত থাকতে হবে যাকে পুজি করে ওরা আমাদের বিপক্ষে প্রপাগান্ডা করতে পারে। প্রপাগান্ডা হতে বাঁচার জন্য জায়েয কাজ হতে বিরত থাকার নযীরও শরিয়তে রয়েছে, মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ বিন উবাইকে উমর রাযিআল্লাহু আনহু হত্যা করতে চাইলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন,

«دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه»

ওকে ছেড়ে দাও, মানুষ যেন বলতে না পারে যে, মুহাম্মদ তার সাথীদের হত্যা করে। সহিহ বুখারী, ৪৯০৫ সহিহ মুসলিম, ২৫৮৪

আমাদের আচরণবিধিতে বলা হয়েছে,
জামা'আত প্রত্যেক ঐসব পন্থায় অর্থ-সম্পদ নেওয়া থেকে বিরত রাখে যার কারণে জিহাদ ও মুজাহিদদের বদনাম হয়।

তিন. জিহাদের জন্য হারাম বা সংশয়যুক্ত সম্পদ উপার্জন করার কোন নযির শরিয়তে নেই, বরং শরিয়ত জিহাদের জন্য দান করার উদ্দেশ্যে উপার্জনের যে পদ্ধতি আমাদের শিখিয়েছে তা হলো,

لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، ف جاء أبو عقيل بنصف صاع،
وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة
هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رياء، فنزلت: {الذين يلمزون
المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا
(1018): صحيح مسلم (جهدهم). صحيح البخاري: (4668)

ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, ‘আল্লাহ তায়ালা যখন আমাদেরকে সদকার আদেশ করেন, তখন আমরা কুলিগিরি করে সদকা করতাম, একদিন আবু আকীল আধা সা’ পরিমান খেজুর নিয়ে আসেন, অপর ব্যক্তি অনেক সদকা নিয়ে আসে, তখন মুনাফিকরা বলে, আল্লাহ তায়ালা আবু আকীলের (সামান্য) সদকার প্রয়োজন নেই, আর এ তো লোক দেখানোর জন্য (অনেক) সদকা করেছে, তখন এই আয়াত নাযিল হয়, মুমিনদের মধ্যে হতে যারা (বেশি পরিমাণে) নফল সদকা করে, এবং যারা নিজেদের সাধ্যানুযায়ী সামান্য দান করে, (মুনাফিকরা তাদের সমালোচনা করে, তাদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, আল্লাহ

তায়লা তাদের সাথে ঠাট্টা করেন, এবং তাদের জন্য রয়েছে, কঠোর শাস্তি)। -সহিহ বুখারী, ৪৬৬৮ সহিহ মুসলিম, ১০১৮

সুতরাং আমরা জিহাদের জন্য দান করতে চাইলে আমাদের কর্তব্য হলো কোন হালাল পেশার মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন করে তা দান করা। যদি এতে দানের পরিমাণ কম হয় তবে তাই ভালো। কেননা বিজয় তো শুধু আল্লাহ তায়লার পক্ষ থেকেই। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত, ১২৭) আর জিহাদের জন্য আমাদের জানমাল ব্যয় হচ্ছে আসবাব, যা আল্লাহ তায়লার কুদরতের আবরণমাত্র, যেহেতু আল্লাহ তায়লা দুনিয়াতে আসবাব ছাড়া কিছু দেন না, তাই আমাদের আসবাবগ্রহণ করতে হবে, যদি আমরা শরিয়ত অনুমোদিত গন্ডির মধ্য থেকে আমাদের সাধ্যের সবটুকু চেলে জিহাদের জন্য প্রস্তুতিগ্রহণ করি তাহলে বাকী সবকিছুর ব্যবস্থা আল্লাহই করে দিবেন।

আর মনে রাখতে হবে ইসলামে মর্যাদার ভিত্তি একমাত্র তাকওয়া। তাই ইসলাম কোন হালাল পেশাকে অবজ্ঞা করে না এবং পেশাকে মর্যাদার মাপকাঠিও বানায় না। দাউদ আলাইহিস সালাম বর্ম তৈরী করে জীবীকা নির্বাহ করতেন। (সূরা আশ্বিয়া, ৮০, সূরা সাবা, ১০-১১; সহিহ বুখারী, ২০৭২) যাকারিয়া আলাইহিস সালাম ছিলেন কাঠমিস্ত্রী। (সহিহ

মুসলিম, ২৩৭৯) মুসা আলাইহিস সালাম দশবছর ছাগল চড়িয়েছেন, (সূরা কাসাস, আয়াত, ২৭) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ছাগল চরিয়েছেন, বরং রাসূলের পূর্বে যত নবী এসেছেন, সবাই ছাগল চড়িয়েছেন। সহিহ বুখারী, ২২৬২

চার. যদিও প্রয়োজনের কারণে এখন ইমামতি, কুরআন শিক্ষা ও অন্যান্য দ্বীনী কাজের বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয হওয়ার ফতোয়া দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তারপরও দ্বীনী কাজ যথাসম্ভব বিনিময় ছাড়া করা এবং জীবীকার জন্য মানুষের হাদিয়ার মুখাপেক্ষী না হয়ে অন্য কোন হালাল পেশা অবলম্বন করাই উত্তম। এতে দ্বীনী কাজের সওয়াব পুরোপুরিভাবে পাওয়া যায়। এমনকি জিহাদে গণীমত পেলেও জিহাদের সওয়াব দুই-তৃতীয়াংশ কমে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« ما أكل أحد طعاما قط، خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن
نبي الله داود عليه السلام، كان يأكل من عمل يده». صحيح
البخاري: (2072)

কোন ব্যক্তি নিজের হাতের কামাইয়ের চেয়ে উত্তম খাদ্যগ্রহণ করেনি। আল্লাহর নবী দাউদও নিজের হাতের উপার্জন দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করতেন। -সহিহ বুখারী, ২০৭২

عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة، إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة، ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة، تم لهم أجرهم». صحيح مسلم (1906)

আব্দুল্লাহ বিন আমর রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে বাহিনী আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে গণীমত পেল তারা তাদের সওয়াবের দুই তৃতীয়াংশ দুনিয়াতেই নিয়ে নিল, আর তাদের জন্য আখেরাতে শুধু একতৃতীয়াংশই বাকী থাকবে। আর যারা গণীমত পাবে না তারা আখেরাতে পূর্ণ প্রতিদান পাবে।
সহিহ মুসলিম, ১৯০৬

পাচ. খতম তারাৰী খালেস একটি ইবাদত, যা নামায-রোযার মতো ইবাদতে মাকসূদার অন্তর্ভুক্ত। আর এ ধরনের ইবাদতের বিনিময় বা বেতন দেওয়া-নেওয়া উম্মতে মুসলিমার ঐক্যমতের ভিত্তিতে নাজায়েয। এতে না কোনো মাযহাবের মতপার্থক্য আছে, না পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ফকীহগণের মাঝে কোনো মতভেদ আছে। ইমামতির বেতন ঠিক করা এবং তা আদায় করা যদিও পরবর্তী ফকীহগণের দৃষ্টিতে জায়েয। কিন্তু খতম তারাৰী বিনিময়টা ইমামতির জন্য হয় না। বরং তা মূলত কুরআন খতমের বিনিময়ে হয়ে থাকে। আর তেলাওয়াতের বিনিময়

গ্রহণ করা সকল ফকীহের নিকট হারাম এবং হাদিসেও
তিলাওয়াতের বিনিময় গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري، قال: سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول: "اقرأوا القرآن، ولا تغلوا فيه، ولا
تجفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به" قال الحافظ في
وإسناده قوي : (9/101) الفتح

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা
কুরআন পাঠ করো। তাতে সীমালঙ্ঘন করো না, তা থেকে
দূরে থেকে না, তা দ্বারা ভক্ষণ করো না এবং তার মাধ্যমে
প্রাচুর্য কামনা করো না। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৫৫২৯
হাফেয ইবনে হাযার হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। -ফাতহুল
বারী, ৯/১০১ দারুল ফিকর।

عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن معقل : أنه صلى بالناس في
شهر رمضان، فلما كان يوم الفطر بعث إليه عبيد الله بن زياد
بحلة وبخمسنة درهم فردها وقال : أخبرنا لا نأخذ على القرآن
رواه ابن أبي شيبة: 7821. أجرا

আবু ইসহাক সাবীযী রাহ. বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মা'কিল
রাহ. রমযান মাসে তারাবীহর নামায পড়ালেন। ঈদুল
ফিতরের দিন উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ তাকে এক জোড়া

কাপড় এবং পাঁচশ দিরহাম হাদিয়া দিলে তিনি তা এই বলে ফিরিয়ে দিলেন যে, আমরা কুরআন তিলাওয়াতের কোনো বিনিময় গ্রহণ করি না। -মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস ৭৮২১

حدثنا محمد بن بشر ، قال : حدثنا عبد الله بن الوليد ، قال : أخبرني عمر بن أيوب ، قال : أخبرني أبو إياس معاوية بن قرة، قال : كنت نازلا على عمرو بن النعمان بن مقرن ، فلما حضر رمضان جاءه رجل بألفي درهم من قبل مصعب بن الزبير ، فقال : إن الأمير يقرئك السلام ويقول : إنا لم ندع قارئاً شريفاً إلا قد وصل إليه منا معروف فاستعن بهذين على نفقة شهرك هذا ، فقال عمرو : اقرأ على الأمير السلام وقل والله ما قرأنا القرآن نريد به الدنيا ورده عليه. رواه ابن أبي شيبة: 7820

মুয়াবিয়া বিন কুররাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি আমার বিন নোমান বিন মুকরিন রহিমাহুল্লাহর নিকট অবস্থান করছিলাম, রমযানে (কুফা-বসরার গভর্নর) মুসয়াব বিন যোবায়েরের পক্ষ থেকে একব্যক্তি তার নিকট দুই হাজার দিরহাম হাদিয়া নিয়ে এসে বললো, আমির আপনাকে সালাম জানাচ্ছেন এবং বলছেন, সকল সম্মানিত কারীকেই আমরা হাদিয়া দিয়েছি, আপনিও এই টাকা দিয়ে আপনার এই মাসের প্রয়োজন পূরো করুন। তখন আমার সেই টাকা এ কথা বলে ফিরিয়ে

দিলেন যে, আমরা দুনিয়া উপার্জনের জন্য কুরআন পড়িনি।

-মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, ৭৮২০

হয়, যদিও বর্তমানে কোন কোন আলেম খতম তারাভীহর বিনিময় গ্রহণ করা বৈধ বলছেন, তবে অধিকাংশ মুহাক্কিক আলেম যেহেতু তা নাজায়েয বলছেন, তাই এটি কমপক্ষে মুশতাবিহ বা সংশয়যুক্ত বিষয়ের আওতায় অবশ্যই পড়বে, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في
الشبّهات: كراع يرعى حول الحمى، يوشك أن يواقع صحیح
(1599): صحیح مسلم (52): البخاري

যে ব্যক্তি (এমন) সংশয়পূর্ণ বিষয় বেঁচে থাকবে সে তার দ্বীন ও সম্মান নিয়ে বাঁচলো। আর যে এমন সংশয়পূর্ণ বিষয়ে নিপতিত হলো সে অচিরেই হারামে নিপতিত হবে। -সহিহ বুখারী, ৫২ সহিহ মুসলিম, ১৫৯৯

সুতরাং এ সবকিছুর দিকে লক্ষ্য করে সার্বিক বিবেচনায় বলা যায়, জিহাদের জন্য দান করার নিয়তে খতম তারাভীহর বিনিময় গ্রহণ করা বৈধ হবে না। বরং হাফেয সাহেবগণ যদি জিহাদের জন্য দান করতে চান তাহলে রমযানে তারাভীহর পাশাপাশি তারা কোন হালাল পেশা অবলম্বন করতে পারেন। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন।

১২. জিহাদে ব্যস্ত থাকার কারণে পরিবারের ভরণপোষণ না করার বিধান

এক ভাই কমেন্টে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন, প্রশ্নটির উত্তর যেহেতু সবারই জানা থাকা জরুরী, তাই নতুন শ্রেণে উত্তর দিচ্ছি:

প্রশ্ন: জিহাদের কাজ করতে গিয়ে তার পরিবার চলার মত টাকা যদি না হয়, আর জিহাদের জন্য মাল জরুরী তাই আগে মাল সংগ্রহ করে পরে জিহাদে গেলে তবে তার কি ফরজ তরকের গুনাহ হবে???

উত্তর: পূর্বে জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার সময় যে বিধান ছিল তা এখন সবক্ষেত্রে ছবছ প্রয়োগ হবে না। কেননা আমরা দীর্ঘমেয়াদী গ্লোবাল যুদ্ধে রয়েছি, আমাদের উপর যেমনিভাবে দখলদার কাফেরদের হতে মুসলিমভূমিগুলো মুক্ত করা ফরয, তেমনি মুরতাদ শাসকদের হটিয়ে ইসলামী হুকুমত কায়েম করাও ফরয। তাই জিহাদের জন্য হিজরত করে ময়দানেই যেতে হবে, বিষয়টা এমন নয়, বরং প্রতিটি ভূখন্ডের মুসলিমদের সেই দেশের তাগুত সরকারের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে হবে। আর এখনও যেহেতু স্বশস্ত্র যুদ্ধের

মারহালা আসেনি, বরং প্রস্তুতি চলছে, আর প্রস্তুতির কাজগুলো অর্থাৎ তাওহিদ ও জিহাদের প্রতি দাওয়াত, , যথাসাধ্য প্রস্তুতিগ্রহণ, অর্থ সংগ্রহ ইত্যাদি যেহেতু জীবিকা উপার্জনের পাশাপাশিও সম্ভব তাই যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোন জিহাদের ময়দানে নির্দিষ্টভাবে আপনার প্রয়োজন দেখা না দেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি পরিবারের ভরণপোষণের পাশাপাশি বেশি থেকে বেশি জিহাদের কাজ করার চেষ্টা করুন। কেননা পরিবারের ভরণপোষণ ও জিহাদ দুটিই ফরয দ্বায়িত্ব, তাই যতক্ষণ পর্যন্ত একটি আরেকটির সাথে সাংঘর্ষিক না হয়ে যায়, ততক্ষণ দুটিই পালন করতে হবে। হাঁ, যদি কখনো দুটি সাংঘর্ষিক হয়ে যায়, যেমন, আপনার বিশেষ কোন যোগ্যতার কারণে নির্দিষ্টভাবে কোন জিহাদের ময়দানে আপনার প্রয়োজন দেখা দেয়, কিংবা মুরতাদ শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধ শুরু করার কারণে সকলের সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তখন পরিবারকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে আপনাকে জিহাদের ময়দানে বেরিয়ে যেতে হবে।

এ বিষয়ে মিস্বারুত তাওহিদের একটি ফতোয়া অনুবাদ করে দিচ্ছি।

প্রশ্ন: এক ভাই আমার নিকট একটি মাসয়ালা জানতে চান, তিনি জিহাদে বের হতে চান, আল্লাহর ইচ্ছায় তার পথও

সুগম, কিন্তু সমস্যা হলো, তিনি পরিবারের বড় ছেলে, একটি দুগ্ধপায়ী শিশু ব্যতীত তার কোন ভাই নেই, তার পিতার বয়স পঞ্চাশ ছুইছুই, তিনি ডায়াবেটিসের রোগী। তার মাও ডায়াবেটিস ও প্রেসারে আক্রান্ত। তিনি কি জিহাদে যাবেন না পরিবারের ভরণপোষণের জন্য থেকে যাবেন?

প্রশ্নকারী

আররায়াতুল ইসলামিয়াহ

উত্তর: পূর্বেও মিস্বারে এধরণের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে, যার খোলাসা হলো, যদি (আপনার বিশেষ যোগ্যতা বা অন্য কোন কারণে) আপনার প্রতি মুজাহিদদের প্রয়োজন দেখা না দেয়, কিংবা আপনার দ্বারা তাদের বড় কোন উপকার হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে এবং (আগ্রাসী) কাফেররা আপনার ভূমিতে আক্রমণ না করে থাকে এবং আপনার দেশের মুজাহিদগণ মুরতাদ শাসকদের বিপক্ষে যুদ্ধ শুরু না করে থাকে, আপনার সাহায্যের তাদের প্রয়োজন না পড়ে, তাহলে পিতা-মাতার সেবার জন্য আপনি তাদের পাশে থাকতে পারবেন। যদি আপনি তাওহিদ ও জিহাদের দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত থাকেন, জিহাদের প্রতি আপনার দূর্বীর আকর্ষণ থাকে এবং জিহাদের জন্য (যথাসাধ্য) প্রস্তুতি নিতে থাকেন, তাহলে আশা করি আল্লাহ

তায়লা আপনাকে জিহাদের সওয়াব দান করবেন। যতদিন
না আল্লাহ তায়লা অন্য কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন।

উত্তর প্রদান

শায়েখ আবু উসামা শামী

সদস্য-শরিয়া বিভাগ

মিস্বারুত তাওহিদ

هل ينفر للجهاد ووالداه مريضان ... رقم السؤال: 440
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كتب الله أجركم وسد على الحق خطاكم ... لدي سؤال عرضه
لي أحد الاخوه الافاضل وهو أنه يريد النفير وطريقه سالك بأذن
الله لكنه أكبر أخوانه في بيته ولا يوجد ذكر غيره الا طفل
رضيع وابوه شارف على الخمسين وبه مرض السكري وامه
كذلك عندهاسكري وضغط ايضا شفاهم الله ... فيقول هل ينفر
لارض الجهاد أم يبقى يرعى والديه للسبب الذي ذكرت ...
أسأل الله أن يكتب أجركم ويجعنا وأياكم في جنات النعيم
السائل: الرايه اسلاميه

المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ... أخي السائل: سبقت
الإجابة عن سؤال مشابه لسؤالك فارجع إليه في قسم الجهاد
وأحكامه إن شئت والخلاصة أنه ما لم تتعين حاجة
المجاهدين إليك أو كان عندك نفع عظيم لهم ولجهادهم، و لم
يحل العدو بأرضك ولا باشر المجاهدون قتال المرتدين عندك
ولا احتاجوا لنصرتك، فإن لم يكن ينطبق على حالتك شيء من

هذه الصور؛ فلا حرج عليك من البقاء بجانب ... والديك
 لرعايتهما؛ وما دمت تشتغل بالدعوة إلى التوحيد والجهاد على
 بصيرة في بلدك، وتحدث نفسك بالجهاد والغزو وتسعى في
 اعدادها لذلك فمرجو لك ثواب المجاهدين إلى أن يقضي الله أمرا
 كان مفعولا ... والله اعلم
 أجابه، عضو اللجنة الشرعية: ... الشيخ أبو أسامة الشامي

১৩. জিহাদের জন্য সামান্য দানে বিরাট প্রতিদান

ইমাম বুখারী ও মুসলিম আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« من أنفق زوجين في سبيل الله، دعاه خزنة الجنة، كل خزنة باب: أي فل هلم، قال أبو بكر: يا رسول الله، ذاك الذي لا توى عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون (1027): منهم». صحيح البخاري: (2841) صحيح مسلم

যে আল্লাহর রাস্তায় দুটি জিনিষ দান করবে তাকে জান্নাতের সব দরজার প্রহরীরা ডেকে বলবে, হে অমুক, এ দরজা দিয়ে আসো। আবু বকর রাযি. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, (যাকে সকল দরজা দিয়ে ডাকা হবে) তার তো কোন ক্ষতি

হতে পারে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি আশাবাদী, *তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। - সহিহ বুখারী, ২৮৪১, সহিহ মুসলিম, ১০২৭

সহিহ বুখারীর অপর বর্ণণায় এভাবে এসেছে,

من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله

‘যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় যে কোন জিনিষ হতে এক জোড়া ব্যয় করবে’ -সহিহ বুখারী, ৩৬৬৬

এই বর্ণণা হতে বুঝা যায়, যে কোন জিনিষ হতে এক জোড়া অর্থাৎ দুটি জিনিষ জিহাদে দান করার দ্বারাই হাদিসে বর্ণিত মহান ফযীলতটি লাভ করা যাবে, চাই তা দুই দিনার, দুই দিরহাম, দুটি ঘোড়া, দুটি তলোয়ার, যাই হোক, (বর্তমান যমানা হিসেবে এক টাকার দুটি কয়েন বা দুই টাকার দুটি নোট সদকা করেও এই ফযীলত লাভ করা যাবে।

ইমাম মুহাম্মাদ মালেকী বলেন,

في هذا الحديث أن الجهاد أفضل الأعمال، لأن المجاهد يعطي أجر المصلي والصائم والمتصدق وإن لم يفعل ذلك، لأن باب الريان للصائمين، وقد ذكر في هذا الحديث أن المجاهد يدعى من تلك الأبواب كلها بإنفاق قليل المال في سبيل الله. فتح (الباري: 6/49 ط. دار الفكر، مصور عن الطبعة السلفية

এই হাদিস থেকে বুঝে আসে, জিহাদ সর্বোত্তম আমল, কেননা মুজাহিদকে (নফল) নামায, রোযা ও দানের সওয়াব দেওয়া হয়, যদিও সে এগুলো না করে, কেননা রাইয়ান দরজাটি রোযাদারদের জন্য, কিন্তু এই হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে জিহাদে সামান্য দানের কল্যাণেই মুজাহিদকে জান্নাতের সব দরজা থেকে ডাকা হবে। -ফাতহুল বারী, ৬/৪৯

তাই আমাদের সকলেরই জিহাদে দানের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া উচিত, বেশি দান করতে না পারার কারণে দানের ব্যাপারে অবহেলা করা এবং কিছুই দান না করা নিতান্তই মাহরুমির কারণ। যারা ইখলাসের সাথে সামান্য দান করে আল্লাহ ও তার রাসূল তাদের প্রশংসা করেছেন, ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন,

لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع، وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رياء، فنزلت: {الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا (1018): صحيح مسلم (جهدهم)}. صحيح البخاري: (4668)

আল্লাহ তায়ালা যখন আমাদেরকে সদকার আদেশ করেন, তখন আমরা কুলিগিরি করে সদকা করতাম, একদিন আবু

আকীল আধা সা’ পরিমান খেজুর নিয়ে আসেন, অপর ব্যক্তি অনেক সদকা নিয়ে আসে, তখন মুনাফিকরা বলে, আল্লাহ তায়ালার আবু আকীলের (সামান্য) সদকার প্রয়োজন নেই, আর এ তো লোক দেখানোর জন্য (অনেক) সদকা করেছে, তখন এই আয়াত নাযিল হয়, মুমিনদের মধ্যে হতে যারা নফল সদকা করে, এবং যারা নিজেদের সাধ্যনুযায়ী সামান্য দান করে, (মুনাফিকরা) তাদের সমালোচনা করে, (তাদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে, আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে ঠাট্টা করেন, এবং তাদের জন্য রয়েছে, কঠোর শাস্তি)। -সহিহ বুখারী, ৪৬৬৮ সহিহ মুসলিম, ১০১৮

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« سبق درهم مائة ألف » قالوا: يا رسول الله وكيف؟ قال: « رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، ورجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله مائة ألف، فتصدق بها». أخرجه النسائي: (2528) وأحمد: (8929) وابن خزيمة (2443)، وابن حبان والحاكم: (1519) وصححه ووافقه الذهبي، وقال (3347) الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد: إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الصحيح غير ابن عجلان، فقد روى له البخاري تعليقا ومسلم في الشواهد، وهو صدوق لا بأس به

এক দিরহাম দান করে লাখো দিরহাম দান করার চেয়ে

বেশি সওয়াব পাওয়া যায়। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, এটা কিভাবে? রাসূল বললেন, এক ব্যক্তির দুটি দিরহাম ছিল সে তার একটি দান করলো, অপর ব্যক্তি তার রাশি রাশি মাল থেকে এক লাখ দিরহাম দান করলো।-

সুনানে নাসায়ী, ২৫২৭ মুসনাদে আহমদ, ৮৯২৮ সহিহ ইবনে খুয়াইমা, ২৪৪৩ সহিহ ইবনে হিব্বান, ৩৩৪৭ মুস্তাদরাকে হাকেম, ১৫১৯ হাফেয যাহাবী ও শায়েখ শুয়াইব আরনাউত হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

অর্থাৎ যে দুই দিরহামের একটি দান করেছে সে তার অর্ধেক সম্পদ দান করেছে, আর যে এক লাখ দিরহাম দান করেছে সে তার সম্পদের অর্ধেকের চেয়েও অনেক কম দান করেছে, তাই এক দিরহাম দানকারী লাখো দিরহাম দানকারীর চেয়েও বেশি সওয়াব পাবে। [/color]

সুনানে নাসায়ীর টীকায় আল্লামা সিন্দী রহ. বলেন,

ظاهر الأحاديث أن الأجر على قدر حال المعطي، لا على قدر المال المعطي، فصاحب الدرهمين حيث أعطى نصف ماله في حال لا يعطي فيها إلا الأقوياء، يكون أجره على قدر همته، بخلاف الغني، فإنه ما أعطى نصف ماله، ولا في حال لا يعطي فيها عادة.

এ ধরণের হাদিস থেকে বুঝে আসে, সওয়াব দেওয়া হবে

দাতার অবস্থা অনুযায়ী, দানের পরিমাণ অনুযায়ী নয়। যে দুই দিরহামের একটি দান করেছে সে তার অর্ধেক সম্পদ দান করেছে, আর যে এক লাখ দিরহাম দান করেছে সে তার সম্পদের অর্ধেকের চেয়েও অনেক কম দান করেছে, তাই এক দিরহাম দানকারী লাখো দিরহাম দানকারীর চেয়েও বেশি সওয়াব পাবে।

অপর হাদিসে এসেছে,

جاء ثلاثة نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: يا رسول الله، كانت لي مائة دينار، فتصدقت منها بعشرة دنانير. وقال الآخر: يا رسول الله، كان لي عشرة دنانير، فتصدقت منها بدينار، وقال الآخر: يا رسول الله (2) كان لي دينار، فتصدقت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم في بعشره. قال الأجر سواء، كلكم تصدق بعشر ماله

তিন ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এলো, তাদের একজন বললো, হে আল্লাহর রাসূল, আমার একশো দিনার ছিল, আমি তা হতে দশ দিনার দান করেছি। আরেকজন বললো, আমার দশ দিনার ছিল, আমি তা হতে একদিনার দান করেছি। তৃতীয়জন বললো, আমার একদিনার ছিল, আমি তার একদশমাংশ দান করেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের সকলে

সমান সওয়াব পাবে, তোমরা সবাই তার সম্পদের একদশমাংশ দান করেছো। -মুসনাদে আহমদ, ৭৪২ এ হাদিসটির সনদ যযীফ, তবে যযীফ হাদিস দিয়ে অন্য হাদিসের ব্যাখ্যা করা যায়। দেখুন আছারুন্ন হাদিসিশ শরিফ, শায়েখ আওয়ামা, পৃ: ৪০

عن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: «جهد المقل». أخرجه أبو داود: (1677) وأحمد: (8702) وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد: (إسناده صحيح) وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقاته على مسند أحمد وأبي داود: (إسناده صحيح، وقوله: جُهد المقل: أي: قدر ما يحتمله حال من قل ماله، وهو بمعنى الوسع والطاقة، والمراد: ما يعطيه المقل على قدر طاقته)

আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, কোন সদকা উত্তম? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দরিদ্র ব্যক্তির সামর্থ্য অনুযায়ী সদকা। -সুনানে নাসায়ী, ২৫২৬, সুনানে আবু দাউদ, ১৪৪৯ শায়েখ আহমদ শাকের ও শুয়াইব আরনাউত হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

আমরা অনেকে হয়তো সাধ্যমত দানের প্রতি অবহেলা করি এই ভেবে যে, এই সামান্য দানে কি হবে, যেখানে একটি সাধারণ ক্লাশিনকোভের মূল্য লাখখানি টাকা? কিন্তু এই

চিত্তাও ঠিক নয়। আসলে আমরা সবাই আল্লাহর তায়ালার কুদরতের আবরণ মাত্র। কাফেরদের শাস্তি তো আল্লাহ তায়ালার নিজেই দেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার আমাদের পরীক্ষা করার জন্য আমাদের জানমাল দিয়ে জিহাদ করার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালার বলেন,

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ (سورة الأنفال: 60) فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ

কাফেররা যেন ধারণা না করে না যে তারা (আল্লাহর হাত থেকে) পালিয়ে বাঁচবে, বস্তুত তারা কখনোই আল্লাহ তায়ালাকে পরাস্ত করতে পারবে না, (নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালার তাদেরকে পাকড়াও করবেন এবং শাস্তি দিবেন) আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন তোমরা এর দ্বারা ভীতী সঞ্চার করতে পারো আল্লাহর শত্রু এবং তোমাদের শত্রুদের অন্তরে। আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের অন্তরে যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। বস্তুত যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের উপর কোন জুলুম করা হবে না। -সূরা

দেখুন, এখানে আল্লাহ তায়ালা বলছেন যে, কাফেররা তার থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারবে না। তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেনই। তবে যেহেতু দুনিয়া দারুল আসবাব, আল্লাহর তায়ালা রীতী হলো আসবাব-উপকরণ গ্রহণ না করলে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে কোন কিছু দেন না, তাই আমাদের দ্বায়িত্ব হলো আমাদের সাধ্যানুযায়ী শক্তি অর্জন করা এবং জিহাদের উপকরণ অর্থাৎ ঘোড়া-অস্ত্রসস্ত্র ইত্যাদি যোগাড় করা। যদি আমরা আমাদের সাধ্যানুযায়ী শক্তি অর্জন করি এবং জিহাদের অস্ত্রসস্ত্রের যোগান দেওয়ার জন্য সাধ্যমত দান করি তাহলে আল্লাহ তায়ালাই গায়েব হতে বাকী সবকিছুর ব্যবস্থা করে দিবেন। এরপর আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আমরা জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য যা কিছুই দান করবো (কম হোক বা বেশি) আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তার প্রতিদান দান করবেন। দুনিয়াতে গণিমত লাভের মাধ্যমে আর আখেরাতে সাওয়াব ও জান্নাতের মাধ্যমে।

সুতরাং আমার দান কম না বেশি তা মূল কথা নয়, বরং মূল বিষয় হলো, আমি আমার সাধ্যানুযায়ী দান করলাম কি না?

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে জিহাদের জন্য বেশি বেশি দান করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

১৪.জিহাদের সামর্থ্য না থাকলে তিনটি করণীয়

জিহাদ বিরোধী আলেম ও শায়েখদের জিহাদ থেকে মানুষকে বিরত রাখার জন্য একটি বড় হাতিয়ার হলো, জিহাদের শক্তি না থাকার দাবী করা, তাদের মতে এখন যেহেতু আমাদের জিহাদের শক্তি নেই তাই হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে, কিন্তু জিহাদের শক্তি না থাকলেও যে আরো কিছু করণীয় আছে তা তারা একেবারেই ভুলে বসেছে। তাই সামর্থ্য না থাকলে আমাদের উপর যে সব দ্বায়িত্ব বর্তায় তা হতে তিনটি দ্বায়িত্বের ব্যাপারে আলোচনা করছি, বলাবাহুল্য এই তিনটি কাজই পালন করা শরিয়তের হুকুম অনুযায়ী ফরয, কিন্তু জিহাদ-বিরোধী শায়েখ ও আলেমরা এর কোনটিই পালন করছেন না, কাউকে পালন করতে আদেশও করছেন না।

এক. যুদ্ধের জন্য যথাসম্ভব প্রস্তুতি গ্রহণ করা, শক্তি অর্জন করা, ঈমानी ও আসকারী অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ও সামরিক উভয় প্রকার শক্তি।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ
عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرِيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ

“আর তাদের মোকাবেলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত কর, যার দ্বারা তোমরা আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের নিজেদের দুশমনদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত রাখবে এবং ঐ সব দুশমনকেও যাদেরকে তোমরা জাননা কিন্তু আল্লাহ জানেন।” -সূরা আনফাল, আয়াত: ৬০

এর ব্যাখ্যায় ইমাম জাসসাস রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: ৩৭০ হি.) বলেন:

أمر الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بإعداد السلاح والكراع
قبل وقت القتال إرهاباً للعدو والتقدم في ارتباط الخيل استعداداً
لقتال المشركين . اهـ

দুশমনদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত রাখার জন্য যুদ্ধের সময় আসার পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে অস্ত্রপাতি ও ঘোড়া প্রস্তুত করতে এবং এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতিস্বরূপ পূর্ব থেকেই অশ্ববাহিনী প্রস্তুত করতে আদেশ দিয়েছেন।” -আহকামুল কুরআন: ৩/৮৮

অন্যত্র বলেন:

قوله تعالى: {ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة} العدة ما يعده الإنسان ويهيئه لما يفعله في المستقبل ... وهذا يدل على وجوب الاستعداد للجهاد قبل وقت وقوعه، وهو كقوله: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل}. اهـ

আল্লাহ তাআলার বলেন, যদি তারা যুদ্ধে বের হওয়ার ইচ্ছা করতো, তবে তার প্রস্তুতিস্বরূপ সরঞ্জাম গ্রহণ করত) العدة বলা হয় ঐ জিনিসকে যা মানুষ ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করে রাখে। এ আয়াত প্রমাণ করে, জিহাদের সময় আসার পূর্বেই তার জন্য ই'দাদ-প্রস্তুতি গ্রহণ করে রাখা ফরয। এ আয়াত ঐ আয়াতের মতো যেখানে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ

‘তাদের মোকাবেলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত কর’। -আহকামুল কুরআন: ৩/১৫৪

“যুদ্ধের সময় আসার পূর্বেই” “যা মানুষ ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করে রাখে” এ সকল বাক্য থেকে বুঝে আসে যুদ্ধের ক্ষমতা না থাকলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা ফরয।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন:

يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت
سقوطه للعجز، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. اهـ

“সামর্থ্য না থাকার কারণে জিহাদ করা সম্ভব না হলে, শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত করার মাধ্যমে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ ফরয হবে। কেননা, যে জিনিস ব্যতীত ফরয আদায় করা সম্ভব না হয় সেটাও ফরয হয়ে থাকে। -মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/২৫৯

আল্লামা আলাউদ্দীন কাসানী রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: ৫৮৭ হি.)
বলেন,

ان الاصل في الامان أن لا يجوز لان القتال فرض والامان
يحرّم القتال الا إذا وقع في حال يكون بالمسلمين ضعف
وبالكفرة قوة لوقوعه وسيلة إلى الاستعداد للقتال في هذه الحالة
فيكون قتالا معنى إذ الوسيلة إلى الشيء حكمها حكم ذلك الشيء
اهـ

“মূলত কাফেরদেরকে আমান-নিরাপত্তা দেয়া জায়েয নেই।
কেননা, কিতাল ফরয। আর আমান কিতালকে নিষিদ্ধ করে।
তবে মুসলমানরা দুর্বল এবং বিপরীতে কাফেররা শক্তিশালী

হলে তা জায়েয হবে। কেননা, তখন তা কিতালের ই'দাদ-প্রস্তুতি গ্রহণের ওসীলা হচ্ছে। ফলে সেটি তখন অর্থগতভাবে কিতালের নামান্তর। কারণ, কোন বস্তুর যে বিধান, উক্ত বস্তু পর্যন্ত পৌঁছতে যেটি ওসীলা হয়, সেটির বিধানও তা-ই।” - বাদায়েউস সানায়ে: ৯/৩১১

আল্লামা কাসানীর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, দুর্বলতার সময়ে মুসলমানদের জন্য শক্তিঅর্জন করা ফরয। তাহলে এই শক্তিঅর্জন জিহাদের হুকুমে হবে এবং এর দ্বারা সর্বদা জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পালন হবে। শরিয়তের মূলনীতি হলো, কোন ফরয কাজ পুরোপুরি আদায় করা সম্ভব না হলে যতটুকু সম্ভব ততটুকু আদায় করাই ওয়াজিব হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যতটুকু পারো। -সূরা তাগাবুন, আয়াত: ১৬ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم তোমাদের কোন কাজের আদেশ করলে তোমরা সাধ্যনুযায়ী তা পালন করো। -সহীহ বুখারী: ৭২৮৮ সহীহ মুসলিম: ১৩৩৭

শায়েখ ইযযুদ্দীন বিন আব্দুস সালাম বলেন,

من كلف بشيء من الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن
بعضه فإنه يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه مكتبة
الكليات الأزهرية: 2/7

যাকে কোন কাজের আদেশ করা হয়, কিন্তু সে তার কিছু
অংশ পালন করতে সক্ষম, আর কিছু অংশ পালন করতে
অক্ষম তাহলে তার জন্য সামর্থ্যের অংশটুকু আদায় করা
তার উপর ওয়াজিব হবে, আর যা পালন করতে অক্ষম তা
তার থেকে রহিত হয়ে যাবে।

তাছাড়া জিহাদ ওয়াজিব হোক বা না হোক, যুদ্ধের জন্য
যথাসম্ভব প্রস্তুতি গ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র
ফরয দ্বায়িত্ব। ফুকাহায়ে কেরাম একে ফরয কেফায়া
বলেছেন, কেননা এ শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্য হলো
কাফেরদের অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করা, যেন তারা মুসলমানদের
দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস না পায় এবং মুসলমানরা
তাদের সহজ শিকারে পরিণত না হয়। আল্লাহ তায়ালা
প্রস্তুতির আদেশ দেওয়ার পর বলেন, ثُرْهُبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ
وَتَوْمَرَا أەر দ্বারা কাফেরদের অন্তরে ভীতিসঞ্চার
করবে। আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ
أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً

(সালাতুল খওফ বা যুদ্ধকালীন নামাযের সময়) তারা যেন
নিজেদের আত্মরক্ষার অবলম্বন ও অস্ত্রসস্ত্র গ্রহণ করে,
কাফেররা চায় তোমরা তোমরা তোমাদের অস্ত্রসস্ত্র ও
সামানাদি থেকে অসতর্ক হয়ে যাও, তাহলে তারা তোমাদের
উপর একবারে ঝাঁপিয়ে পড়বে। -সূরা নিসা, আয়াত: ১০

আল্লামা আবুস সাউদ রহিমাছল্লাহ বলেন,

{ وَأَعِدُّوا لَهُمْ } توجيهُ الخطاب إلى كافة المؤمنين لما أن الأمور
به من وظائف الكل {مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّن قُوَّةٍ} من كل ما يُتَّقَى به
في الحرب كائناً ما كان

“আল্লাহ তাআলার বাণী وَأَعِدُّوا لَهُمْ (তোমরা তাদের
মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত কর...) এতে সকল ঈমানদারকে
সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা, আদিষ্ট বিষয়টি সকলেরই
দায়িত্ব। ... مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّن قُوَّةٍ ... (তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী
শক্তি) অর্থাৎ যুদ্ধের ক্ষেত্রে শক্তিবর্ধক এমন সব কিছু, চাই
তা যাই হোক না কেন।

আল্লামা আলুসী রহিমাছল্লাহ রুহুল মাআনীতে হুবহু একই
কথা বলেছেন, ইমাম কুরতুবী রহিমাছল্লাহ (মৃত্যু: ৬৭১ হি.)
বলেন,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ} أمر الله سبحانه المؤمنين بإعداد القوة للأعداء {
 بعد أن أكد تقدمه التقوى. فإن الله سبحانه لو شاء لهزمهم بالكلام
 والتقل في وجوههم وبحفنة من تراب ، كما فعل رسول الله
 صلى الله عليه وسلم. ولكنه أراد أن يبتلي بعض الناس ببعض
 بعلمه السابق وقضائه النافذ. وكلما تعده لصديقك من خير أو
 ..لعدوك من شر فهو داخل في عدتك
 وتعلم الفروسية واستعمال الأسلحة فرض كفاية وقد يتعين. اهـ
 (تفسير القرطبي: 8/36 ط. دار عالم الكتب)

আল্লাহ তায়লা তাকওয়া অর্জনে গুরুত্বারোপ করার পর
 মুমিনদের শক্তি অর্জনের আদেশ দিয়েছেন, আল্লাহ চাইলে
 ওদেরকে কথা, চেহারায় থুথু নিক্ষেপ বা (ওদের দিকে)
 একমুষ্টি মাটি নিক্ষেপ করার দ্বারাই পরাজিত করতে
 পারতেন, যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
 করেছেন, কিন্তু তিনি তার ইলম ও ফয়সালা অনুযায়ী কিছু
 মানুষকে অপর কিছু মানুষের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। তুমি
 তোমার বন্ধুর জন্য যা কিছু ভালো, এবং শত্রুর জন্য যা কিছু
 মন্দ প্রস্তুত করে রাখো, তার সবই বা প্রস্তুতিগ্রহণের
 অন্তর্ভুক্ত। অশ্চালনা শিক্ষা করা এবং অস্ত্রপাতির ব্যবহার
 রপ্ত করা ফরযে কিফায়া। তবে কখনো কখনো ফরযে আইন
 হয়ে যায়।” তাফসীরে কুরতুবী: ৮/৩৬

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযি রহিমাল্লাহু (মৃত্যু ৬০৬ হি.) বলেন,

قال أصحاب المعاني: الأولى أن يقال: هذا عام في كل ما يتقوى به على حرب العدو، وكل ما هو آلة للغزو والجهاد فهو من وهذه الآية تدل على أن الاستعداد للجهاد بالنبل ... جملة القوة والسلاح وتعليم الفروسية والرمي فريضة، إلا أنه من فروض الكفايات.

মুফাসসিরগণ বলেন, এখানে قوة শব্দ দ্বারা যুদ্ধের ক্ষেত্রে শক্তিবর্ধক সব কিছু উদ্দেশ্য, সুতরাং যা কিছুই যুদ্ধের মাধ্যম হয় তাই قوة বা শক্তির অন্তর্ভুক্ত। ... এ আয়াত থেকে বুঝে আসে জিহাদের জন্য তীর, অস্ত্র ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং অশ্বচালনা ও তীরন্দাজী শিক্ষা করা ফরয, তবে তা ফরযে কেফায়াহ।

দুই. মুরতাদ শাসকের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করা। তার অধীনে কোন প্রকার চাকুরী না করা। বিশেষকরে এমন চাকুরী যা শাসককে টিকিয়ে রাখা এবং তার শক্তি বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

عن أبي سعيد وأبي هريرة، قالاً: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لِيَأْتِيَنَّ عَلَيْكُمْ أَمْراءُ يَقْرَبُونَ شَرارَ النَّاسِ، وَيؤْخَرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيْتِهَا، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، فَلَا يَكُونُ عَرِيفًا: وَلَا شَرْطِيًّا وَلَا جَابِيًّا وَلَا خَازِنًا. رواه ابن حبان في صحيحه

(4586)

‘আবু সাইদ ও আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু আনহুমা থেকে
 বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,
 তোমাদের শাসক হবে এমন কিছু লোক যারা মন্দ
 লোকদেরকে আপন বানাবে, নামায বিলম্ব করে পড়বে ।
 যারা ঐ যমানা পাবে তারা যেন গোত্রের সর্দার, কোতোয়াল,
 খাজনা উসূলকারী ও কোষাধ্যক্ষ না হয়’। -সহিহ ইবনে
 হিব্বান, ৪৫৮৬

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله
 صلى الله عليه وسلم خطيباً، فكان من خطبته أن قال: «ألا إني
 أوشك أن أدعى فأجيب فيليكم عمال من بعدي، يقولون بما
 يعلمون، ويعملون بما يعرفون، وطاعة أولئك طاعة، فيلبثون
 كذلك دهراً، ثم يليكم عمال من بعدهم، يقولون ما لا يعلمون،
 ويعملون ما لا يعرفون، فمن ناصحهم، ووازرهم، وشد على
 أعضادهم فأولئك قد هلكوا، خالطوهم بأجسادكم، وزايلوهم
 بأعمالكم، واشهدوا على المحسن بأنه محسن، وعلى المسيء
 بأنه مسيء». رواه البيهقي في الزهد الكبير: رقم الحديث: 191
 وقال الهيثمي في 6988: ورواه الطبراني في المعجم الأوسط
 مجمع الزوائد: (رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه محمد بن
 علي المروزي، وهو ضعيف). قال الراقم عفا الله عنه: والإسناد
 الذي رواه البيهقي في الزهد الكبير ليس فيه محمد بن علي،
 ولهذا صححه الألباني في السلسلة الصحيحة

‘শোনো, অচিরেই আমার ডাক এসে যাবো এবং আমি তাতে সাড়া দিবো। আমার পরে তোমাদের শাসক হবে এমন লোকেরা যারা নিজেদের কথাকে কাজে পরিণত করবে এবং ভালো কাজ করবে। তোমাদেরকে তাদের আনুগত্যের আদেশই করা হয়েছে। এ অবস্থা চলবে কিছুকাল। অতপর এমন লোকেরা তোমাদের শাসক হবে যারা কাজ না করেই তা করার দাবী করবে এবং মন্দ কাজ করবে। সুতরাং যারা তাদের কল্যাণকামী হবে, তাদের পরামর্শদাতা হবে এবং তাদেরকে শক্তি যোগাবে তারা ধ্বংস হল। তোমরা (বাধ্য হলে) তোমাদের দেহ দ্বারা তাদের সাথে মিশতে পারো, কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে তাদের থেকে পৃথক থাকবে এবং ভালো শাসকের ব্যাপারে ভালো হওয়ার ও মন্দ শাসকের ক্ষেত্রে মন্দ হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করবে’। -বাইহাকী, আযযুহদুল কাবীর, হাদীস নং: ১৯১

তিন. স্বেচ্ছায় তার শাসক হওয়ার স্বীকৃতি না দেওয়া, তার বিধান মেনে না নেওয়া এবং এমন কোন শব্দ ব্যবহার না করা যা তার শাসক হওয়ার স্বীকৃতি প্রদান করে, যেমন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মহামান্য রাষ্ট্রপতি বা এজাতীয় কোন সম্মানসূচক বাক্য ব্যবহার না করা।

عن بريدة، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا للمنافق: سيد، فإنه إن يك سيديكم فقد أسخطتم ربكم. رواه أبو داود: (22939) وصححه النووي في الأذكار ص 455 ط. دار الريان للتراث، والعراقي في تخريج أحاديث الإحياء: ص 836 ط. مكتبة طبرية

‘বুরাইদাহ রাযিআল্লাহু আনহু বর্ণণা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা মুনাফিককে ‘সর্দার’ বলোনা। কেননা যদি মুনাফিক তোমাদের সর্দার হয় তাহলে তোমরা তোমাদের প্রভুকে অসন্তুষ্ট করলে’। -সুনানে আবু দাউদ, ৪৯৭৭

ইমাম নববী রহিমাল্লাহু (মৃত্যু: ৬৭৬ হি) বলেন,

لا بأس بإطلاق فلان سيد، ويا سيدي، وشبه ذلك إذا كان المسوّد فاضلاً خيراً، إما بعلم، وإما بصلاح، وإما بغير ذلك، وإن كان فاسقاً، أو متهماً في دينه، أو نحو ذلك، كره له أن الأذكار للنووي ص 455 ط. دار الريان للتراث. يقال سيّد

‘নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যদি ইলম বা আমলের ক্ষেত্রে ফযীলতের অধিকারী হয় তাহলে তাকে নেতা-সর্দার বা ‘হে আমার সর্দার’ এবং এজাতীয় অন্যান্য শব্দ বলাতে কোন সমস্যা নেই, কিন্তু যদি সে ফাসেক হয় বা বেদ্বীন হওয়ার অভিযোগে

অভিযুক্ত হয়ে তাহলে তাকে সর্দার বলা মাকরুহ হবে,। -
আলআযকার, পৃ: ৪৫৫

১৫.তালেবানরা কি আসলেই মাজারপূজারী?

ইদানীং একটি ছবি নজরে পড়লো, যাতে কিছু তালেবান নেতৃবৃন্দ উযবেকিস্তানে অবস্থিত ইমাম বুখারীর মাজার যিয়ারতে গিয়ে মাজারের সামনে দাড়িয়ে হাত তুলে দোয়া করছেন। এ ছবির মাধ্যমে কেউ কেউ মুযাফফর বিন মুহসিনের সেই কুখ্যাত উক্তির স্বপক্ষে দলিল দেয়ার চেষ্টা করেছে যে, তালেবানরা নাকি মাজারপূজারী, একারণেই নাকি তারা বৌদ্ধমূর্তি ভাঙ্গলেও মাজার ভাঙেনি।

কিন্তু আসলেই কি তালেবানরা মাজারপূজারী?

উত্তর: মাজারপূজা হলো, মাজারে সেজদা করা কিংবা মাজারস্থ মৃতব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করা। কিন্তু যদি কেউ মাজারে গিয়ে আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করে তাহলে এখানে শিরকের কি হলো? খোদ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কবরের কাছে হাত তুলে দোয়া করেছেন। সহিহ মুসলিমের হাদিসে এসেছে,

عن عائشة قالت: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: بلى، قال: قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي

صلى الله عليه وسلم فيها عندي، انقلب فوضع رداءه، وخلع
 نعليه، فوضعهما عند رجليه، وبسط طرف إزاره على فراشه،
 فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت، فأخذ رداءه
 رويدا، وانتعل رويدا، وفتح الباب فخرج، ثم أجافه رويدا،
 فجعلت درعي في رأسي، واختمرت، وتقنعت إزاري، ثم
 انطلقت على إثره، حتى جاء البقيع فقام، فأطال القيام، ثم رفع
 (974)يديه ثلاث مرات ... صحيح مسلم

‘আয়েশা রাযি. বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসুলুল্লাহ
 সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আমার কথা শুনাবো না?
 আমরা বললাম, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বর্ণনা করুন। রাবী বলেন,
 তিনি বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার
 পালার যে রাতে আমার কাছে ছিলেন, সে রাতে তিনি বাইরে
 থেকে এসে তার ‘রিদা’ (গায়ের উপরের অংশের চাঁদর) ও
 জুতা খুলে ফেললেন এবং জুতা দুটি তার পায়ের দিকে
 রেখে ‘ইযারের’ (গায়ের নিচের অংশের চাঁদর) এক কিনারা
 বিছানার উপর বিছিয়ে দিলেন এবং শুয়ে পড়লেন। তিনি
 এতটুকু সময় অপেক্ষা করেন যতটুকু সময়ে তিনি আমার
 ঘুমিয়ে পড়ার ধারণা করলেন। তারপর অতি সন্তর্পণে চাদর
 নিলেন, জুতা পরলেন ও দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন।
 তারপর সাবধানে দরজা বন্ধ করে চলে গেলেন। আমিও
 আমার ওড়না মাথায় দিলাম, জামা পরে নিলাম এবং ইযার
 বেঁধে নিলাম। তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
 ওয়াসাল্লাম এর পিছনে পিছনে রওনা হলাম। তিনি বাকীউল

গারকদ (কবরস্থানে) পৌঁছে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন।
তিনবার হাত উঠিয়ে (দোয়া করলেন)। তারপর ফিরে
আসতে লাগলেন,। -সহিহ মুসলিম: ৯৭৪

হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী রহ. বলেন,

فيه استحباب إطالة الدعاء وتكريره ورفع اليدين فيه وفيه أن
دعاء القائم أكمل من دعاء الجالس في القبور. شرح النووي
(7/43) على مسلم

‘এই হাদিস প্রমাণ করে দীর্ঘক্ষণ ও বারবার দোয়া করা এবং
দোয়ার সময় হাত উত্তোলন করা মুস্তাহাব। এবং এটাও
প্রমাণ করে যে, কবরের কাছে দাঁড়িয়ে দোয়া করা বসে
দোয়া করার চেয়ে উত্তম।’ -শরহ সহিহ মুসলিম: ৭/৪৩

অপর হাদিসে এসেছে,

عن عائشة، أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم
ذات ليلة، فأرسلت بريرة في أثره، لتتنظر أين ذهب، قالت:
فسلك نحو بقيع الغرقد، فوقف في أدنى البقيع، ثم رفع يديه، ثم
انصرف، فرجعت إلي بريرة، فأخبرتني، فلما أصبحت سألته،
فقلت: يا رسول الله، أين خرجت الليلة؟ قال: " بعثت إلى أهل
البقيع لأصلي عليهم". رواه أحمد (24612) وقال الشيخ شعيب
إسناده : (41/160): الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد

محتمل للتحسين، أم علقمة بن أبي علقمة: -وهي مرجانة- روى عنها اثنان، أحدهما ابنها، وذكرها ابن حبان في "الثقات" وقال العجلي: مدينة تابعة ثقة. وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. غير عبد العزيز بن محمد: وهو الدراوردي، فقد أخرج له البخاري مقرونا أو تعليقا، واحتج به الباقون، وهو حسن الحديث، وقد توبع

‘আয়েশা রাযি. বলেন, এক রাত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে তার কাপড় পরিধান করলেন, এরপর বের হয়ে গেলেন। তখন আমি আমার বাদী ‘বারীরা’কে তার পেছনে পেছনে যেতে আদেশ দিলাম, তিনি কোথায় যান তা দেখার জন্য। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘বাকীউল গরকাদে’র দিকে গেলেন এবং তার নিকটে গিয়ে দাঁড়ালেন, এরপর হাত তুলে (দোয়া করে) ফিরে আসলেন। বারীরা (রাসূলের পূর্বেই) ফিরে এসে আমাকে সব অবগত করল। সকালবেলা আমি নবীজিকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমি ‘বাকী’তে অবস্থানরত (মৃতদের) প্রতি প্রেরিত হয়েছিলাম, তাদের জন্য দোয়া করার উদ্দেশ্যে।’ -মুসনাদে আহমদ: ২৪৬১২; শায়েখ শুয়াইব আরনাউত হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম আবুল ওয়ালিদ বাজী বলেন,

وفي هذا إتيان القبور والدعاء لأهلها عندها (المنتقى شرح

الموطأ 2 / 34

এ হাদিস হতে কবর যিয়ারত করা ও কবরের নিকট দাড়িয়ে কবরস্থ ব্যক্তিদের জন্য দোয়া করার প্রমাণ মিলে। -
আলমুনতাকা: ৩৪/২

আর তালেবানদের নেতৃস্থানীয় লোক তো দূরের কথা সাধারণ কোন তালেবানও কবরে সেজদা করে কিংবা কবরস্থ মৃত ব্যক্তির নিকট সাহায্য চায়- এরকম কোন দলিল কি মুযাফফর সাহেবের কাছে আছে? মূর্খ আফগান জনগণ মাজারে সেজদা করলে তার দোষ কি তালেবানদের ঘাড়ে চাপানো যাবে? আর মাজার না ভঙ্গাই কি মাজারপূজারী হওয়ার দলিল? আপনাদের নেতা মুহাম্মদ বিন সালমান ও অন্যান্য আরব শাসকরা তো তথাকথিত 'বিলাদুত তাওহিদ' সহ জাযিরাতুল আরবের পবিত্র ভূমিতে মন্দির নির্মাণের অনুমতি দিচ্ছে? মার্কেটে মূর্তি বিক্রির অনুমতি দিচ্ছে, মূর্তি ভঙ্গকারীকে গ্রেফতার করছে, তাহলে কি তাদেরকে মূর্তিপূজারী বলা যাবে? এমন ডাবলষ্ট্যান্ডার্ড আর কত দিন?

অবশ্য, এখানে তিনটি বিষয় লক্ষণীয়:

এক. কবর যিয়ারতে গিয়ে মূলত দোয়া করা হবে কবরস্থ ব্যক্তির জন্য। অবশ্য কবরস্থ ব্যক্তির পাশাপাশি নিজের জন্য দোয়া করাও নিসন্দেহে বৈধ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে শিখিয়েছেন, তারা যেন কবর যিয়ারতে গিয়ে এ দোয়া পড়ে,

السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا، إن شاء
الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية

‘আসসালামু আলাইকুম। কবরবাসী মুমিন ও মুলমানদের উপর সালাম বর্ষিত হউক। ইনশাআল্লাহ আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হব। আমাদের এবং তোমাদের সবার জন্য আল্লাহর নিকট শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।’ -সহিহ মুসলিম: ৯৭৪

কিন্তু কেউ কেউ মনে করে, নেককার ব্যক্তির কবরে গিয়ে দোয়া করা হলে তা বেশি কবুল হবে। অথচ কুরআন-সুন্নাহয় এর কোন ভিত্তি নেই এবং নিজের প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে কবর বা মাজারে গিয়ে দোয়া করার কোন দৃষ্টান্তও সাহাবা-তাবেয়ীদের থেকে পাওয়া যায় না। তাই তা একটি বিদয়াত ও গর্হিত কাজ, যদিও দোয়া আল্লাহ তায়ালার কাছেই করা হোক না কেন। (দেখুন, মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৭/১৬৫)

দুই: আলেমগণ বলেছেন, কবর যিয়ারতে হাত তুলে দোয়া করতে চাইলে কবরকে সামনে রেখে দোয়া করবে না। বরং কবরকে পাশে বা পেছনে দিয়ে কেবলামুখী হয়ে দোয়া করবে। এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন হাদিস নেই। মূলত আলেমগণ ইজতেহাদ ও কিয়াসের ভিত্তিতে এ শর্ত করেছেন। কারণ হাদিসে কবরের দিকে ফিরে নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে, এতে শিরকের পথ খোলে। (সহিহ মুসলিম: ৯৭২) বর্তমান প্রজন্ম কোন নেককার বুয়ুর্গের কবরের দিকে ফিরে নামায পড়লে পরবর্তী প্রজন্ম মনে করবে তারা কবরস্থ বুয়ুর্গেরই ইবাদত করছে। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম শিরকের সূচনা এভাবেই ঘটেছিল। (সহিহ বুখারী: ৪৯২০) তাই শিরকের পথ বন্ধ করার জন্য কবরের দিকে ফিরে নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। তো তেমনিভাবে কবরের দিকে মুখ করে দোয়া করা হলেও কেউ মনে করতে পারে, কবরস্থ নেককার ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করা হচ্ছে। এতে শিরকের দুয়ার খুলবে। কিন্তু যদি কবরকে পাশে বা পেছনে রেখে কেবলামুখী হয়ে দোয়া করা হয়, তাহলে আশা করা যায়, কোন পাগলও মনে করবে না যে, বুয়ুর্গের কবরকে পাশে বা পেছনে দিয়ে বুয়ুর্গের নিকটই সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। (দেখুন, ইকতিয়াউস সিরাতিল মুস্তাকিম, ইবনে তাইমিয়াহ, ২/২৩৯)

তালেবানদের ছবিতে দেখা গেছে তারা কবরকে সামনে রেখেই হাত তুলে দোয়া করছেন। তো এটা তাদের ভুল। সম্ভবত তারা এ বিষয়টি জানেন না। নতুবা এটা তো হানাফি মাযহাবেরও মাসয়ালা, যে মাযহাব তারা কঠোরভাবে মেনে চলেন। (দেখুন, মাসিক আলকাউসার, লিংক:

<https://www.alkawsar.com/bn/qa/answers/detail/1013/>)

সুতরাং যদি তারা এটা জানতেন তাহলে নিশ্চয়ই তারা এমনটা করতেন না। আসলে আমাদের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরা/সভাকক্ষে বসে ধূমায়িত চা-কপির পেয়ালা সামনে নিয়ে সহিহ আকীদা ও ইলম চর্চা যতটা সহজ, প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবত একাধিক পরাশক্তির সাথে যুদ্ধরত আফগান-তালেবানদের জন্য তা ততটাই কঠিন। আর যুদ্ধ কবলিত একটি দেশে যুদ্ধের ব্যস্ততা ও নিরাপত্তার ঘাটতির কারণে পরস্পর সাক্ষাৎ ও ইলমী আলোচনাও কঠিন। তাই আলকায়েদার মুজাহিদগণও এসব বিষয়ে তাদের সাথে তেমন আলোচনার সুযোগ পাচ্ছেন না। তারপরও আলহামদুলিল্লাহ, তালেবানরা এখন তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় মাদ্রাসা চালু করেছে, ইলমের চর্চা বৃদ্ধি করেছে। ইনশাআল্লাহ, যখন ইমারতে ইসলামী পূর্ণ বিজয় লাভ করবে তখন ব্যাপকভাবে ইলমচর্চা শুরু হবে এবং আফগানে অবস্থানরত আরব মুহাজির ও মুজাহিদগণ তাদের এসব মাসায়েল বুঝানোর সুযোগ পাবেন। এর মাধ্যমে এসব

বিষয়ে তাদের আমল আরো বেশি শরিয়তসম্মত হবে
ইনশাআল্লাহ।

সুতরাং এসব বিষয়ে একটু উনিশ-বিশ হয়ে গেলেই একে
কেন্দ্র করে সমালোচনার কোনই যৌক্তিকতা নেই। আশ্চর্য,
একদিকে তালেবানদের এসব সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতিকে
তাদের কুফর-শিরকের প্রমাণরূপে পেশ করা হচ্ছে,
অপরদিকে মাদখালীদের নেতা মুহাম্মদ বিন সালমান সহ
সকল আরব শাসকরা যখন আমেরিকার সাথে বন্ধুত্ব করে,
মুসলমানদের হত্যায় তাদের সহযোগিতা করে, তখন তা
কুফর তো দূরের কথা, হারামও হয় না, তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা
করা শুরু করা হয়! বিন সালমান নাইটক্লাব তৈরি করলেও
তা শরিয়তসম্মত হয়ে যায়! শেখ হাসিনা পর্দা নিয়ে ব্যাঙ্গ
করলেও তা কবিরা গুনাহ হয়, কুফর হয় না!

আর যদি মেনে নেই, তালেবানরা এ মাসয়ালা জেনেও ইচ্ছে
করেই কবরকে সামনে রেখে দোয়া করেছেন, তবেও তা
বেশি থেকে বেশি মাকরুহে তাহরিমি বা নাজায়েয হবে?
শিরক তো দূরের কথা তা হারামও বলা যায় না। কারণ
আমরা আগেও বলেছি, কবরের দিকে ফিরে দোয়া করা
যাবে না- এ বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন হাদিস নেই। এটা কিয়াসী
মাসয়ালা। আর আহলে হাদিস ভাইয়েরা যেহেতু কিয়াস
মানেন না, তারা কিয়াসকে শয়তানী যুক্তি বলেন, তাহলে

তো তাদের নিকট এটা নাজায়েযও হওয়ার কথা না। পারলে এ বিষয়ে তারা তাদের শর্ত অনুযায়ী ‘সহিহ সরিহ মারফু মুত্তাসিল’ (সহিহ সুম্পষ্ট নিরবচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত রাসূলের হাদিস) দেখাক?

তিন: আমরা মাজার ভাঙ্গার বিরোধিতা করছি না? সহিহ মুসলিমের হাদিসে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাযি. কে মূর্তি ভাঙ্গার ও উঁচু কবর ভেঙ্গে মাটির সাথে মিশিয়ে সমান করে দেয়ার আদেশ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এ নির্দেশ তো ছিল মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে আরব ভূমিতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তামকীন লাভ করার পর। (দেখুন: -নাসায়ী, আসসুনানুল কুবরা, ১১৪৮৩ মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০২৫৫ তবাকাতু ইবনি সা’দ, ১/২৪৩; ২/১১০-১১২; ৪/১৮১ ৭/৩৪২ যাদুল মাআদ, ইবনুল কাইয়িম, ৩/৫২৩) তামকীন বা ক্ষমতা লাভের পূর্বে মাজার ভাঙ্গা হলে হিতে বিপরীত হতে পারে। মূর্খ জনসাধারণ এতে বিরূপ হয়ে মুজাহিদদের বিপক্ষে চলে যেতে পারে। এ কারণেই তো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ চলমান অবস্থায় চোরের হাত কাটতে নিষেধ করেছেন, যেন সে এতে ক্ষিপ্ত হয়ে শত্রুবাহিনীতে যোগ না দেয়। বুসর বিন আরতাত বলেন,

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع الأيدي في الغزو. رواه الترمذي (1450) وأبو داود (4408) وقال الشيخ شعيب في تعليقه على سنن أبي داود (6/458) : إسناده صحيح، فقد قال ابن عدي في "الكامل" في ترجمة بسر بن أبي أرطاة -ويقال في اسمه: ابن أرطاة-: لا أرى بإسناده بأساً. قلنا: ونقل المناوي عن الذهبي أنه قال تعقياً على قول ابن معين عن بسر بأنه كان رجل سوء: الحديث جيد لا يرد بمثل هذا، وقال ابن حجر في "الإصابة" 1/ 289 عن إسناده هذا الحديث: إسناده مصري قوي.

‘আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে হাত কাটা হবে না।’ (হাফেয যাহাবী, হাফেয ইবনে হাজার ও শায়েখ শুয়াইব আরনাউত হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। দেখুন, জামে তিরমিযি, ১৪৫০; সুনানে আবু দাউদ: ৪৪০৮; বাংলা হাদিস লিংক:

<https://www.hadithbd.com/hadith/sear...=1&WADbSearch1> আলমুগনী, ইমাম ইবনে কুদামা: ৯/৩০৯)

দেখুন, আইসিস পূর্ণ তামকীন লাভের পূর্বেই শিয়াদের মাজার ভেঙ্গে ওদেরকে হত্যা করে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। যার ফলে সাধারণ শিয়ারাও আমেরিকা ও সরকারী বাহিনীর সাথে আইসিসের বিপক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। তাদের পরাজয়ের পর এখন ইরাক সরকার আরব আমিরাতের

সহযোগিতায় সেসব মাজার পুনরায় নির্মাণ করছে। তো কি লাভ হলো?

এসব কথা বললে, আইসিসের ভাইয়েরা বলেন, আমরা নাকি হিকমত-মাসলাহাতের নামে শরিয়তের বিধান ছেড়ে চাচ্ছি? যেন হেকমত-মাসলাহাত বলতে শরিয়তে কিছুই নেই। আসলে এখানে দুটি বিষয়,

ক. হেকমত-মাসলাহাতের নামে শরিয়তের বিধান একেবারেই বাদ দেয়া। তা বাস্তবায়নের জন্য কোন ব্যবস্থা বা পদ্ধতি অবলম্বন না করা কিংবা এমন অকার্যকর কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা যা দ্বারা কখনোই শরিয়তের বিধান বাস্তবায়ন করা যাবে না। যেমন, গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম কায়েম, শাসকদের দাওয়াত দিয়ে ভালো বানিয়ে তাদের মাধ্যমে ইসলাম কায়েমের চেষ্টা ইত্যাদি। অথচ গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম কায়েমের চেষ্টা শরিয়ত সমর্থন করে না। তাছাড়া গত পঞ্চাশ বছরে মিসর, ফিলিস্তিন, তুরস্ক, ঘানা, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, পাকিস্তান সহ যতদেশে যতবারই ইসলামী দল ক্ষমতায় গিয়েছে তাদের দ্বারা কখনো ইসলাম কায়েম হয়নি, কখনো হবেও না। দাওয়াতের মাধ্যমে যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণও ভালো হয়ে যায় এবং তারা ইসলামী হুকুমত চায়ও কিন্তু তাগুতরা যখন ইসলাম কায়েমে বাধা

দিবে তখন শক্তি ব্যতীত তাদেরকে কিভাবে হটানো যাবে?

খ. শরিয়তের বিধান কায়েমের জন্য কার্যকর পদ্ধতি ও প্রস্তুতি গ্রহণ করা, যেন প্রস্তুতির পর উপযুক্ত সময়ে শরিয়তের বিধান কায়েম করা যায়। যেমন কোন ব্যক্তি বা দল ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে চাইলে প্রথম দিনই যদি তারা অস্ত্র নিয়ে নেমে যায়, তাহলে নির্ঘাত তারা শেষ হয়ে যাবে। তাই তাদের কর্তব্য হলো, প্রথমে দাওয়াত দিয়ে একটি শক্তিশালী বাহিনী তৈরি করা, যাদের সহযোগিতায় তাগুতকে হটানো যাবে। দেখুন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু মক্কায় দাওয়াতের প্রথম দিনই তরবারী নিয়ে নেমে যাননি। বরং তিনি দাওয়াত দিয়ে দিয়ে একটি উপযুক্ত বাহিনী তৈরি করেছেন। এরপর তাদের নিয়ে মদিনায় জিহাদ শুরু করেছেন। তেমনভাবে শক্তি অর্জন হওয়ার পূর্বে মুনাফিকদের ব্যাপারেও আল্লাহ তায়ালা নির্দেশে তিনি নম্রতা অবলম্বন করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে ইসলাম শক্তিশালী হওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা তাকে মুনাফিকদের সাথেও কঠোরতা করার নির্দেশ দেন।

তো এটা হলো আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ বাস্তবায়নের হেকমতসম্মত পন্থা। তাই মাজার ভাঙ্গার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যদি পূর্ণ তামকীন হয়ে যায়,

তখন মাজার ভাঙ্গতে তো কোন সমস্যা নেই। কারণ জনগণ তাতে ক্ষিপ্ত হলেও কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি পূর্ণ তামকীন অর্জন না হয় তাহলে প্রথমে জনগণের মধ্যে দাওয়াতি প্রচারণা চালিয়ে তাদেরকে শরিয়তের নির্দেশ বুঝিয়ে, এরপর মাজার ভাঙ্গা হলে তখন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আশংকা থাকবে না। আল্লাহ আমাদের বুঝার তাওফিক দান করুন।

১৬. দাউদ আলাইহি সালাম এবং জিহাদ (প্রথম পর্ব:- যুদ্ধের জন্য শক্তি অর্জন)

একাধিক হাদিসে দাউদ আলাইহিস সালামের নামায ও রোযাকে সর্বোত্তম নামায-রোযা আখ্যায়িত করা হয়েছে। প্রখ্যাত সাহাবী আমর বিন আস রাযি. এর ছেলে আব্দুল্লাহ প্রতিদিন রোযা রাখতেন, সারারাত তাহাজ্জুদ পড়তেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন,

إنك إذا فعلت ذلك، هجمت له العين، ونهكت لا صام من صام الأبد، صوم ثلاثة أيام من الشهر، صوم الشهر كله» قلت: فإنني أطيق أكثر من ذلك، قال: «فصم صوم داود، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، ولا يفطر إذا لاقى

“তুমি এরূপ করলে চোখ বসে যাবে এবং শরীর দুর্বল হয়ে

পড়বে। যে সারা বছর রোযা রাখলো সে যেন কোন রোযাই রাখলো না। মাসে তিন দিন রোযা রাখো, সারা বছর রোযা রাখার সওয়াব পাবে। আমি বললাম, আমি এর চেয়ে বেশী করার সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, তাহলে তুমি দাউদ আলাইহিস সালামের মতো রোযা রাখো, তিনি একদিন রোযা রাখতেন আর একদিন ছেড়ে দিতেন এবং শত্রুর মুখোমুখি হলে পলায়ন করতেন না। -সহিহ বুখারী, ৩৪১৯ সহিহ মুসলিম, ১১৫৯

হাদিসের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন,

في قوله: "ولا يفر إذا لاقى" إشارة إلى حكمة صوم يوم وإفطار يوم، قال الخطابي: محصل قصة عبد الله بن عمرو أن الله تعالى لم يتعبد عبده بالصوم خاصة، بل تعبده بأنواع من العبادات، فلو استفرغ جهده لقصر في غيره، فالأولى الاقتصاد فيه ليستبقى بعض القوة لغيره، وقد أشير إلى ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام في داود عليه السلام "وكان لا يفر إذا لاقى" لأنه كان يتقوى بالفطر لأجل الجهاد. فتح الباري لابن حجر 4)/ (221)

“শত্রুর মুখোমুখি হলে পলায়ন করতেন না” এতে একদিন রোযা রাখা আর একদিন রোযা ছেড়ে দেয়ার হিকমত- কারণের দিকে ইশারা রয়েছে। খতাবী রহ. বলেন, ‘আব্দুল্লাহ

বিন আমরের ঘটনার খোলাসা হলো, আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাকে শুধু রোযা রাখার আদেশ দেননি। বরং তাকে আরো অনেক প্রকার ইবাদতের হুকুম দিয়েছেন। যদি সে রোযাতেই সব শক্তি ব্যয় করে ফেলে তবে অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রে ক্রটি হবে। তাই উত্তম হলো, রোযার ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন যেন অন্যান্য ইবাদতের জন্যও কিছু শক্তি বাকী থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম “শত্রুর মুখোমুখি হলে পলায়ন করতেন না” –এ কথা বলে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন, কেননা দাউদ আলাইহিস সালাম একদিন পর পর রোযা ছেড়ে দিয়ে জিহাদের জন্য শক্তি অর্জন করতেন। -ফাতহুল বারী, ৪/২২১

হাদিস ও হাদিসের ব্যাখ্যা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, জিহাদের জন্য শক্তি অর্জন নবীদের সুন্নাহ। এমনকি তাহাজ্জুদ-রোযা ইত্যাদিও এ পরিমাণ করা যাবে না যে, এতে শরীর দুর্বল হয়ে যায় এবং জিহাদের শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। এর উপর কিয়াস করে বলা যায়, ইলম অর্জনেও এ পরিমাণ ব্যস্ততা কাম্য নয়, যার কারণে জিহাদ করা যায় না, বিশেষ করে যখন জিহাদ ফরযে আইন হয়।

আসলে এ উম্মত হলো জিহাদী উম্মত। জিহাদ এ উম্মতের মাঝে সর্বদা চলমান থাকবে, থাকতে হবে, এটা তার

অস্তিত্বের প্রশ্ন। তাই এ উম্মতকে জিহাদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই অন্যান্য আমল ও দুনিয়াবী কাজ-কর্ম করতে হবে। এজন্যই ইসলামে গণীমত হালাল করে দেয়া হয়েছে, যা পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য হারাম ছিল। শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ বলেন,

أن الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبعثون لي أقوامهم خاصة، وهو محصورون يتأتى الجهاد معهم في سنة أو سنتين ونحو ذلك، وكان أممهم أقوىاء يقدرون على الجمع بين الجهاد والتسبب بمثل الفلاحة والتجارة، فلم يكن لهم حاجة إلى الغنائم، فأراد الله تعالى ألا يخط بعلمهم غرض دنيوي، ليكون أتم لأجورهم، وبعث نبينا صلى الله عليه وسلم إلى كافة الناس، وهم غير محصورين، ولا كان زمان الجهاد معهم محصورا، وكانوا لا يستطيعون الجمع بين الجهاد والتسبب بمثل الفلاحة والتجارة، فكان لهم حاجة إلى إباحة الغنائم حجة الله البالغة (1/217)

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহির পূর্বের নবীগণ নির্দিষ্ট জাতির কাছে প্রেরিত হতেন, যাদের সংখ্যা হতো সীমিত। তাদের সাথে বছরে দুয়েকবার জিহাদ হতো। তাছাড়া তারা ছিল শক্তিশালী জাতি, তারা জিহাদের পাশাপাশি ব্যবসা ও ক্ষেতখামারের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে পারতো। তাই তাদের গণীমতের প্রয়োজন ছিল না। ফলে আল্লাহ তায়ালা চেয়েছেন তাদের আমলের সাথে দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্যের সংমিশ্রণ না ঘটুক, যেন তারা পূর্ণ সওয়াব অর্জন করতে

পারে। পক্ষান্তরে আমাদের নবীকে পাঠানো হয়েছে পুরো মানবজাতির জন্য, যাদের সংখ্যা অসীম এবং তাদের সাথে জিহাদের সময়ও সার্বক্ষণিক, নির্দিষ্ট নয়। তাই তারা ব্যবসা ও ক্ষেতখামারের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে না। এ কারণে তাদের জন্য গনীমত হালাল হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।” -হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা, ১/২১৭

এখন তো ইলম অর্জনের জন্য জিহাদের সমর্থনও করা যায় না, কারণ তাহলে জেল-জুলুমের শিকার হতে হবে, ইলম অর্জনে বিঘ্ন ঘটবে। কিন্তু ফরযে আইন মানলে তো আবার বসে বসে ইলম চর্চার সুযোগও থাকে না। তাই ফরযে আইনও মানা হয় না। বা মানলেও ফরযে আইনের এ অর্থ ‘হার হার ফরদ পর ফরয’ (প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয) মানা হয় না। নতুন নতুন অর্থ আবিষ্কার করা হয়। সত্যিই প্রশ্ন জাগে, যে ইলম আমলের সহায়ক না হয়ে তাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, এমনকি সে ইলমের জন্য খোদ ইলমের মধ্যেও তাহরীফ-বিকৃতি করার প্রয়োজন পড়ে, সে ইলম আসলে কার জন্য? আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য না কি দুনিয়াবী পদ, অর্থ ও সম্মানের জন্য।

কখনো জিহাদের দাওয়াত দেয়া হলে রুচির ভিন্নতার অজুহাত তোলা হয়। বলা হয়, তাদের রুচি হলো জিহাদ আর আমাদের রুচি হলো ইলম। রুচির ভিন্নতা অতি

স্বাভাবিক। কিন্তু ফরযে আইন জিহাদ বাদ দিয়ে রুচির অনুসরণে ইলম অর্জন- এটা কি আল্লাহর হুকুমের পরিবর্তে নিজের রুচি ও প্রবৃত্তির পূজা নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أَفْرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

“তুমি কি দেখেছো তাকে, যে তার প্রবৃত্তিকে নিজ মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে এবং জ্ঞান বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাকে গোমরাহীতে নিষ্ক্ষেপ করেছেন এবং তার কান ও অন্তরে মোহর করে দিয়েছেন আর তাদের চোখের উপর পর্দা ফেলে দিয়েছেন। অতএব আল্লাহর পর এমন কে আছে, যে তাকে সুপথে নিয়ে আসবে? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না।” -সূরা জাছিয়া, ২৩

কেউ আবার নিজের উর্বর মস্তিষ্ক খাটিয়ে জিহাদ হতে বসে থাকার অত্যাশ্চর্যজনক অজুহাত বের করেন। বলেন, ইসলামী হুকুমত থাকলেও তো আমিরুল মুমিনীন সকলকে জিহাদে যেতে বলবেন না, কিছু লোককে তো তিনি ইলম অর্জনে লাগিয়ে রাখবেন, তাই আমরা ইলম অর্জনে লেগে রয়েছি। কিন্তু এই উর্বর মস্তিষ্কের লোকটিকে কে বুঝাবে, আমিরুল মুমিনীন যাদেরকে ইলম অর্জনে লাগাবেন তাদের দায়িত্ব কি হবে বসে বসে আমিরুল মুমিনীনের জিহাদের

বিপক্ষে ফতোয়া প্রদান করা, জিহাদ হতে মানুষকে
 নিরুৎসাহিত করা, না কি জিহাদের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত
 করা, জিহাদের প্রয়োজনীয় মাসায়েল আমিরুল মুমিনীনকে
 সরবরাহ করা? আমরা তো মুহতারাম আলেমদের নিকট
 এতটুকুই আবেদন করছি। আমরা তাঁদের অস্ত্র হাতে নিয়ে
 ময়দানে নামতে বলছি না। আমরা বলছি, আপনারা
 জিহাদের বিষয়েও একটু ইলম অর্জন করেন। কেন এমন
 হয় যে, আমরা যখন জিহাদ বিষয়ক কোন প্রবন্ধ আপনাদের
 সামনে পেশ করি তখন আপনারা কিছু ইশকাল-আপত্তি করে
 তার তাহকীকের দায়িত্ব আমাদেরকে দিয়ে দেন। আর
 নিজেরা শুধু চাঁদের মাসয়ালা, *মুরসাল হাদিস হুজ্জত-দলিল
 কি না? রফয়ে ইদাইন-আমিন বিল জাহর ইত্যাদি সাধারণ
 মাসয়ালা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। তবে কি জিহাদ বিষয়ে ইলম
 অর্জনের দায়িত্ব শুধু আমাদের? কেন এ বিষয়ে অধ্যয়নের
 প্রতি আপনাদের কোন আগ্রহ নেই? আল্লাহ মাফ করুন,
 আপনাদের অবস্থা দেখলে মনে হয়, যেন এ বিষয়ে
 পড়াশোনা করতে আপনারা ভয় পান। কারণ যদি পড়াশোনা
 করে হক স্পষ্ট হয়ে যায় তাহলে তো জেল-জুলুম ও
 ইবতেলা-পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। তাই আপনারা
 কাফেরদের মতো হকের দাওয়াত না শোনার জন্য কানে
 আঙ্গুল দিয়ে রাখতে চান।

এসবই নাহয় বাদ দিলাম, আপনারা কি এটাও জানেন না যে, বর্তমান মুসলিমরা জিহাদকে ঘৃণা করে, অনেকে হদ-কিসাসকেও ঘৃণা করে, বর্বরতা মনে করে। তো শরিয়তের কোন বিধানকে ঘৃণা করা কি কুফর নয়? তাহলে আপনারা তাদের ঈমান ঠিক করা এবং কুফর হতে তাঁদের বাঁচানোর জন্য কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন। না কি আপনারা জিহাদের ব্যাপারে নিজেদের ঈমান ঠিক রেখে, নিজেরা বেঁচে যাবেন আর জনসাধারণকে তাদের ভ্রান্ত আকীদার উপর রেখে দিবেন। এমনকি আপনাদের ঘনিষ্ঠ লোকদের, ভক্ত-মুরীদদের ঈমানটাও ঠিক করার চেষ্টা করবেন না। এটা কি তাদের সাথে গাদ্দারী-বিশ্বাসভঙ্গতা নয়। তারা তো আপনাদের সাথে সম্পর্ক রাখেই এ বিশ্বাসে যে, আপনারা তাদের ঈমান-আকীদা, আমল-আখলাকের পরিশুদ্ধি করবেন। তারা আপনাদের যে হাদিয়া-তোহফা দেয় তাও এর বিনিময়েই দেয়। তো আপনাদের এই হাদিয়া বৈধ হয় কি না তাও ভবার বিষয়। সা'দী রহ. সূরা তাওবার ৩৪ সংখ্যক আয়াতের তাফসীরে যা লিখেছেন সুযোগ হলে তা একটু দেখে নেওয়ার অনুরোধ রইলো।

আচ্ছা, আপনারা তো তালেবানদের জিহাদকে সমর্থন করেন, কিন্তু আপনাদের ভক্ত-মুরীদদের কি অবস্থা? একটি ঘটনা শুনুন, তাবলিগের সাথে সম্পৃক্ত এক দ্বীনদার ব্যক্তি সে

আবার বড় একজন পীর ও মুফতীর মুরিদও। তিনি এতই ভালো মানুষ যে শেষ বয়সে ইবাদত-বন্দেগীর জন্য তিনি ঘর ছেড়ে মসজিদে পাড়ি জমিয়েছেন। মুফতী সাহেবও তার আগ্রহের কারণে মসজিদের সিঁড়ির নিচে তার থাকার জন্য একটি রুম তৈরি করে দিয়েছেন। একদিন ফযরের নামাযের পরে ইমাম সাহেব মুনাজাতে আফগানের মুজাহিদদের জন্য দোয়া করে তখন সেই বৃদ্ধ লোকটি প্রচণ্ড খেপে যান। রাগারাগি শুরু করেন। তার কথাবার্তা থেকে সুস্পষ্টরূপে জিহাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ পায়। মুফতি সাহেব ঘটনাটি জানানো হয়। তখন রমযান মাস ছিল, মসজিদে চল্লিশদিন ব্যাপী ইতেকাফ চলছিল। মুফতি সাহেব মসজিদে এসে সকলকে জড়ো করে জিহাদের ব্যাপারে একটি ভাষণ দেন। এতে সেই ব্যক্তির জিহাদের ব্যাপারে ভুল ধারণা দূর হয় এবং সে পরে যিনি দোয়া করেছেন তাকে বলেছেন যে, আপনাদের কারণে আমার অনেক বড় ভুল দূর হলো। ঘটনাটি আপনি বিশ্বাস করেন বা নাই করেন বাস্তবতা কি এমনটাই নয়। আলেমগণ তালেবানদের সমর্থন করেন, তালেবানদের বিজয়ে খুশি প্রকাশ করেন, কিন্তু পাবলিক কি তা সমর্থন করে? তাহলে পাবলিকের দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক করার জন্য তাঁরা কি পদক্ষেপ নিয়েছেন? আর এটাও কেমন সমর্থন যে, শুধু বিজয়ী হলেই সমর্থন প্রকাশ করা হবে, আর দুর্বল অবস্থায় মুখে কুলুপ এঁটে থাকা হবে, আর্থিক কোন

সাহায্যও করা হবে না এবং যুবকদের জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করে তালেবানদের সহায়তাও করতে বলা হবে না।

উল্লেখ্য, মূল লেখার সাথে প্রাসঙ্গিক হওয়ায় আলেমদের কিছু অবস্থা তুলে ধরা হলো, এ বিষয়গুলো আলোচনার দ্বারা ফায়োদা হলো নিজেরা নিজেদের আকীদা-মানহাজে দৃঢ় হওয়া। তেমনিভাবে দাওয়াতের ময়দানেও এ বিষয়গুলো দিয়ে উপকৃত হওয়া। কিন্তু এ ধরনের বিষয় আলোচনা করা হলে সাধারণত ভাইয়েরা জযবার কারণে আলেমদের যথেষ্ট গালমন্দ শুরু করেন। আমি ভাইদের দ্বীনি জযবা, দ্বীনের জন্য দরদ- এর প্রতি আন্তরিক সম্মান জানাই। কিন্তু এভাবে আলেমদের গালমন্দ করা ঠিক নয়। কারণ এ অঞ্চলে তাদের কুরবানী-আত্মত্যাগের মাধ্যমেই দ্বীন টিকে আছে। তাদের মাধ্যমেই আমরা ইলমে দ্বীন পেয়েছি, যে ইলমের মাধ্যমে আলহামদুলিল্লাহ আজ আমরা হক-বাতিল নির্ণয় করতে পারছি। তাছাড়া প্রকাশ্যে তাদের গালমন্দ করার দ্বারা অনেকে আমাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে যেতে পারে। তাই বিশেষভাবে পাবলিক প্রেসে কথা বলার সময় সতর্কতা অবলম্বন কাম্য। আল্লাহর আমাদের তাওফিক দান করুন।

১৭.দিকে দিকে আজ সুন্নাতুল্লাহর বাস্তবায়ন; কিন্তু আমাদের
অবস্থান কি?

কাফের-মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা রীতি এটাই
যে, তিনি দুনিয়াতেই তাদের শাস্তি দিবেন, ধ্বংস করবেন।
আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي
الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا
تُفُفُوا أَخَذُوا وَقُتِلُوا قَتِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلَ وَلَنْ
الْأَحْزَاب: 60 - 62-تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

মুনাফেকগণ, যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যারা নগরে
গুজব রটিয়ে বেড়ায় তারা যদি বিরত না হয়, তবে আমি
অবশ্যই এমন করবো যে, তুমি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ
করবে, ফলে তারা এ নগরে তোমার সাথে অল্প কিছুদিনই
অবস্থান করতে পারবে- অভিশপ্তরূপে। অতপর তাদেরকে
যেখানেই পাওয়া যাবে পাকড়াও করা হবে এবং তাদেরকে
এক-এক করে হত্যা করে হবে।এটা আল্লাহর রীতি যা পূর্বে
গত হওয়া (কাফেরদের) ক্ষেত্রেও কার্যকর ছিল। তুমি
কখনোই আল্লাহর রীতিতে পরিবর্তন পাবে না। -সূরা
আহযাব: ৬০-৬২

সুতরাং আজ আফগান-ইয়ামান-মালি-সোমালিয়ায় যে কাফের

ও মুসলিম নামধারী মুনাফিকরা নিহত হচ্ছে, তা আল্লাহ তায়ালার এই সুন্নাহ বা রীতিরই বাস্তবায়ন। তা আমাদের ভালো লাগুক বা নাই লাগুক এবং কাফেদের তৈরি তথাকথিত মানবতার মাপকাঠিতে তা উত্তীর্ণ হোক না না হোক, এতে কিছু আসে যায় না। আল্লাহ তায়ালার একদল বান্দাদের দিয়ে এই রীতি চালু রাখবেনই। কারণ এ এক অমোঘ ও অপরিবর্তনীয় রীতি। হ্যাঁ এর পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়েছে। পূর্ববর্তী উম্মতদের আল্লাহ তায়ালার সরাসরি শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করেছেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পর হতে আল্লাহ তায়ালার কাফের-মুনাফিকদের সরাসরি শাস্তি দিবেন না, বরং আমাদের মাধ্যমে শাস্তি দিবেন। আল্লাহ তায়ালার বলেন,

{ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ مَنْ صُدُّوا قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَيَذْهَبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى مَنْ التَّوْبَةُ: 14، 15 - يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো, যাতে আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দান করবেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং মুমিনদের অন্তর জুড়িয়ে দেন। এবং তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা তার তাওবা কবুল করেন। আল্লাহর জ্ঞানও পরিপূর্ণ, তাঁর হিকমত পরিপূর্ণ। -

সূরা তাওবা: ১৪-১৫

এজন্য বর্তমানে এই সুন্নাতুল্লাহর ক্ষেত্রে আমরা তিনটি অবস্থানের কোন একটি গ্রহণ করতে পারি, বুদ্ধিমান যেন ভেবে দেখেন, তিনি কোনটি গ্রহণ করবেন:-

১. এ সুন্নাহর বিরোধিতা করা। বিশ্বে চলমান সকল জিহাদকে শরিয়তবিরোধী সন্ত্রাস আখ্যা দেয়া। জিহাদের মনগড়া নানা শর্ত আবিষ্কার করে তার ভিত্তিতে বর্তমান জিহাদকে অবৈধ ঘোষণা দেয়া। নিঃসন্দেহে এটা হবে আল্লাহ তায়ালার সুন্নাহ ও রীতির বিরোধিতা। তার বিপক্ষে অবস্থান। এ অবস্থান গ্রহণ করলে অযথাই আমাদের আখেরাত বরবাদ হবে, কারণ দুনিয়াতে নিরাপদ থাকার জন্য এমন অবস্থানগ্রহণ জরুরী নয়। বরং এ হলো নিরেট অহংকার। কেউ আমাদের চেয়ে দ্বীনি কাজে এগিয়ে গেছে তা মেনে নিতে কষ্ট হওয়া। নিজেদের দুর্বলতা ও কাপুরুষতা স্বীকার করার পরিবর্তে তাকেই দূরদর্শিতার মোড়কে পেশ করা। যেমনটা উহুদের যুদ্ধের সময় মুনাফিকরা করেছিল। তারা যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার পর মাঝপথ হতে এ কথা বলে ফিরে এসেছিল, **لَوْ نَعْلَمُ قَتَلْنَا لَأَنبَغْنَاكُمْ** ‘যদি আমরা এটাকে যুদ্ধ মনে করতাম, তাহলে আমরা যুদ্ধে শরিক হতাম’। অর্থাৎ এটা তো যুদ্ধ না, বরং আত্মহত্যা, যুদ্ধ তো হয় উভয় পক্ষের

শক্তি সমান হলে। (দেখুন, সূরা আলে ইমরান: ১৬৭
তাফসীরে আবুস সাউদ: ২/১২০ তাওযীহুল কুরআন:
১/২১৯)

২. আল্লাহ তায়ালার এই সুন্নাহ বাস্তবায়নে সক্রিয় কর্মী হওয়া। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা আমাদের হাতেই এর বাস্তবায়ন করবেন, তো যদি আমরা এর বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করতে পারি তাহলে তা হবে মহাসৌভাগ্য। এর মাধ্যমে আমরা মৌখিক ইমানকে কর্মে রূপান্তরিত করে সিদ্দিকিনদের (যারা কথাকে কাজের মাধ্যমে সত্যায়ন করে) অন্তর্ভুক্ত হতে পারবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ -الحجرات:

15

মুমিন তো তারা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অন্তর দিয়ে স্বীকার করেছে, তারপর কোন সন্দেহে পড়েনি এবং তাদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। তারাই তো সত্যবাদী। -সূরা হুজুরাত: ১৫

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَن قَضَىٰ
 نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ
 بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 24 غَفُورًا رَّحِيمًا - الأحزاب: 23،

‘মুমিনদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা আল্লাহর সঙ্গে
 কৃত প্রতিশ্রুতিকে সত্যে পরিণত করেছে এবং তাদের মধ্যে
 এমন লোকও আছে, যারা তাদের নজরানা আদায় করেছে
 (শাহাদাত বরণ করেছে) এবং আছে এমন কিছু লোক, যারা
 এখনও (শাহাদাতের) প্রতীক্ষায় আছে। আর তারা (তাদের
 ইচ্ছার ভেতর) কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটায়নি। (এ ঘটনা
 ঘটানোর কারণ) আল্লাহ সত্যনিষ্ঠদেরকে তাদের সততার
 পুরস্কার দিবেন এবং মুনাফিকদেরকে ইচ্ছা করলে শাস্তি
 দিবেন অথবা তাদের তাওবা কবুল করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ
 অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। -সূরা আহযাব: ২৩-২৪

গ. শুধু আন্তরিক সমর্থন জানানো। অর্থাৎ এ সুন্যাহকে
 সমর্থন করা স্বত্বেও নিজেদের দুর্বলতার কারণে সক্রিয় কোন
 ভূমিকা না রাখা। শুধু অন্তরে সমর্থন জানানো। এতে যদিও
 আমাদের ফরয তরকের গুনাহ হবে, তবে যদি আমরা এর
 কারণে অনুতপ্ত হই, ইস্তেগফার করি, নিজেদের নিরাপত্তা
 শতভাগ ঠিক রেখে যতটুকু সমর্থন করা যায় ততটুকু করি,
 বা কমপক্ষে বিরোধিতা না করি, তবে আশা করা যায়

আল্লাহ তায়ালা আমাদের ক্ষমা করে দিবেন। নিশ্চয়ই সকলের ইমান ও সাহস সমান না। ইলম শিখা অনেকের জন্য সম্ভব হলেও তা প্রকাশ করার মতো বুকের পাটা সবার থাকে না। তাই যদি আলেমগণ কমপক্ষে এ অবস্থান গ্রহণ করতেন, তবেই আমরা সম্ভুষ্ট থাকতাম। কিন্তু তারা সুনাতুল্লাহর সম্পূর্ণরূপে বিরোধিতা করে বসলেন। কাফেরদের সাথে শান্তি ও সম্প্রীতিতে বসবাসের দিবাস্বপ্নে বিভোর হলেন। বরং আরো বেড়ে শাসকদের পক্ষাবলম্বন শুরু করলেন। অথচ মানবরচিত বিধান দ্বারা দেশ পরিচালনাকারী এ শাসকদের তাগুত ও মুনাফিক হওয়া তো কুরআন-সুনাহ হতে স্পষ্ট। আর মুজাহিদদের বিপক্ষে তাগুতের পক্ষাবলম্বন তো অত্যন্ত ভয়াবহ। ইরশাদ হয়েছে,

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ
الطَّاغُوتِ فَقاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا .

(سورة النساء: 76)

“যারা ইমানদার তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাস্তায়। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগুতের পক্ষে। সুতরাং তোমরা যুদ্ধ করতে থাক শয়তানের পক্ষাবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে-(দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত নিতান্তই দুর্বল।” –সূরা নিসা: ৭৬

১৮.ভাইরাস হতে পুরো বিশ্বের মুক্তির জন্য দোয়া; ওয়ালা- বারার দুঃখজনক বিস্মৃতি

ওয়ালা-বারা কুরআনের সবচেয়ে সুস্পষ্ট মাসয়ালা সমূহের একটি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে এই মাসয়ালাটিই উম্মতের নিকট সবচেয়ে বেশি বিস্মিত হয়ে গেছে। তাই আজ অনেক আলেমকেই এ জাতীয় দোয়া করতে শোনা যাচ্ছে, “হে আল্লাহ! আপনি সারা পৃথিবীর লোকদের করোনা হতে মুক্তি দান করুন।” কিন্তু শরিয়ত কি এধরণের দোয়ার অনুমতি দেয়? একদিকে আল্লাহকে ভালোবাসার দাবী অপরদিকে তার শত্রুদের প্রতি মহব্বত, তাদের মুক্তির জন্য দোয়া? আপনার বন্ধু বা নিকটজনের সাথে যদি কেউ শত্রুতা করে তবে কি আপনি তার সাথে শত্রুতা করবেন না? তাকে ঘৃণা করবেন না? তাহলে আল্লাহর শত্রুদের ঘৃণা করতে, তাদের জন্য বদদোয়া করতে কেন আপনার বাধে?

এখন তো দোয়ার পদ্ধতিটা এমন হওয়ার দরকার ছিল- হে আল্লাহ, আপনি মুসলমানদের উপর অত্যাচারী এ কাফেরদের মাঝে মহামারী আরো বাড়িয়ে দেন, এর মাধ্যমে তাদের শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে শেষ করেন, তাদের অর্থনীতিকে ধসিয়ে দেন। আর মুমিনদের এ থেকে মুক্তি দান করুন। এটাই তো

কুরআন-সুন্নাহ আমাদেরকে শিখায়, নূহ আলাইহিস সালামের
নিম্নোক্ত দোয়াটি লক্ষ্য করুন,

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَيَّ الْأَرْضَ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن
تَذَرُهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا رَبِّ اغْفِرْ لِي
وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ
الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا

“নূহ আরও বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! এই
কাফেরদের মধ্য হতে কোন বাসিন্দাকেই পৃথিবীতে বাকী
রাখবেন না। আপনি তাদেরকে বাকী রাখলে তারা আপনার
বান্দাদেরকে বিপথগামী করবে এবং তাদের যে সন্তানাদি
জন্ম নেবে তারাও পাপিষ্ঠ ও ঘোর কাফেরই হবে। হে আমার
প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার পিতা-
মাতাকেও এবং প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকেও, যে ইমানের
অবস্থায় আমার ঘরে প্রবেশ করেছে আর সমস্ত মুমিন পুরুষ
ও মুমিন নারীকেও। আর যারা জালেম তাদের শুধু ধ্বংসই
বৃদ্ধি করুন।” –সূরা নূহ, ২৬-২৮

দেখুন, আয়াতে নূহ আলাইহিস সালাম একইসাথে
কাফেরদের উপর কঠিন বদদোয়া করছেন আর মুমিনদের
জন্য মাগফেরাতের দোয়া করছেন। এটাই তো ওয়ালা-বারা-
কাফেরদের প্রতি কঠোরতা, মুমিনদের প্রতি কোমলতা।

বীরে মাউনার ঘটনায় যখন কাফেররা সত্তর জন মুসলিমকে হত্যা করে তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ একমাস ফজরের নামাযে তাদের উপর বদদোয়া করেন।
আনাস রাযি. বলেন,

دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب
بئر معونة ثلاثين غداة، على رعل، وذكوان، وعصية. صحيح
(677) البخاري (2814) صحيح مسلم

“র’ল, যাকওয়ান ও উসাইয়্যাহ গোত্র যারা বীরে মাউনার সাহাবীদের হত্যা করেছে তাদের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ত্রিশদিন বদদোয়া করেছেন।” -সহিহ বুখারী, ২৮১৪ সহিহ মুসলিম, ৬৭৭

ফকিহগণ বলেছেন, “মুসলমানরা কোন দারুল হারবে গিয়ে যদি বিষাক্ত সাপ-বিচ্ছু দেখতে পায় তবে ক্ষতি হতে বাঁচার জন্য সাপের বিষদাঁত ভেঙ্গে দিবে এবং বিচ্ছুর কাটা বের করে ফেলবে, কিন্তু সেগুলোকে একেবারে হত্যা করে ফেলবে না, যেন সেগুলো বংশবৃদ্ধি করে কাফেরদের দংশন করতে পারে।” -ফতোয়া শামী, ৪/১৪০

ইসা আলাইহিস সালাম ও দাউদ আলাইহিস সালামও বনী ইসরাইলের কাফেরদের উপর বদদোয়া করেছিলেন, যার

कारणे आल्लाह तानेदर वानर ओ शूकरे परिणत करे देन ।

-सूरा मायेदा, १८ आहकामुल कुरआन, जाससास रह.

8/१०8

मुसा ओ हारून आलाईहिस सालाम फेरआउन ओ तार कओमेर जन्य बददोया करेछेन । आल्लाह तायला ताँदेर दोया कबुल करेछेन । फेरआउन ओ तार अनुसारीदेर लोहित सागरे डुबिये मेरेछेन । -सूरा ইউनुस, ८८-९२

উমর রাযিআল্লাহু আনহুর যমানায় সাহাবায়ে কেলাম
তারাবীহর পরে বিতরের নামাযে কাফেরদের জন্য এই
বদদোয়া করতেন-

اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك،
ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم
الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك، إله الحق، ثم يصلي على
النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمسلمين بما استطاع من
خير ثم يستغفر للمؤمنين،

“হে আল্লাহ, আপনি কাফেরদের ধ্বংস করুন, যারা আপনার
পথ থেকে বাধা প্রদান করে, আপনার রাসূলগণকে
মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে, আপনার ওয়াদার প্রতি বিশ্বাস রাখে না।
আপনি তাদের ঐক্য বিনষ্ট করে দিন, তাদের অন্তরে ভয়
ঢেলে দিন এবং তাদের উপর আপনার আযাব-গযব নাযিল

করুন।

এরপর রাসূলের উপর দুরন্দ পড়তেন এবং মুমিনদের জন্য যতবেশি পারতেন কল্যাণের দোয়া ও ইস্তেগফার করতেন। -
সহিহ ইবনে খুযাইমা, ১১০০

ইমাম মালেক রহ. ‘মুয়াত্তা’ কিতাবে সহিহ সনদে বর্ণনা করেন,

مالك، عن داود بن الحصين؛ أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان.

(আবু হুরাইরা রাযি. এর শাগরেদ বিশিষ্ট তাবেয়ী) আব্দুর রহমান আলআ’রজ রহ. বলেন, আমি মানুষকে রমযান মাসে (তারাবীতে) কাফেরদের জন্য বদদোয়া করতে দেখেছি। -
মুয়াত্তা মালেক, ৩৮১

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে কাফেরদের শাস্তি দেয়ার দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। কিন্তু আমরা কাপুরুষতার কারণে তা করিনি। আমাদের কার্যকলাপে প্রতীয়মান হয় বনী ইসরাইলের মতো আমরাও বলি, ‘হে আল্লাহ, আপনিই গিয়ে

যুদ্ধ করুন।’ যাই হোক, আমাদের কারণে তো আল্লাহ তার মাযলুম বান্দাদের ছেড়ে দিবেন না। আমরা তাদের সাহায্য না করলেও আল্লাহ করোনার মাধ্যমে তাদের সহায়তা করেছেন, তাদের উপর অত্যাচারী কাফেরদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছেন। কিন্তু এতেও আমাদের আপত্তি! কোথায় এই প্রতিশোধে খুশি হবেন, কাফেরদের জন্য আরো বদদোয়া করবেন, কিন্তু না, এখানে অসহায় (?) কাফেরদের জন্য আমাদের দরদ উথলে উঠছে, তাদের মুক্তির জন্য আমরা দোয়া করছি!

আসলে এসব কিছুই ওয়ালা-বারার মাসয়ালার বিস্মৃতির পরিণতি। **শায়েখ আবু মুহাম্মদ মাকদিসী যথার্থই বলেছেন, “যে ব্যক্তি মুসলিম-কাফেরের মাঝে পার্থক্য করতে পারবে না তার জন্য পুরো দ্বীনই এলোমেলো হয়ে যাবে। তার নিকট দ্বীনের সব বিধিবিধান উলট-পালট হয়ে যাবে।”** (আররিসালাতুছ ছালাছিনিয়্যাহ, পৃ:১০) পরিস্থিতি আজ এ পর্যন্ত গড়িয়েছে যে মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ (হাফিযাছল্লাহ) এর মতো বিদগ্ধ আলেমও প্রকাশ্যে নাস্তিক কবি শামসুর রহমানের জঘন্য উক্তি “আযানের শব্দ বেশ্যার আওয়াজের মতো মনে হয়”-এটা উদ্ধৃত করেও এই কাফেরের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করছেন। (তুরক্ষে-তুর্কিস্তানের সন্ধানে) অথচ তিনি ইতিমধ্যে কুরআনের একটি

তাফসীরও রচনা করেছেন আর কুরআন দ্ব্যর্থহীনভাবে
কাফেরদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করতে নিষেধ করছে,
ইরশাদ হয়েছে,

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا
أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

এটা নবী ও মুমিনদের পক্ষে শোভনীয় নয় যে, তারা
মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তাতে তারা আত্মীয়-
স্বজনই হোক না কেন, যখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে,
তারা জাহান্নামী। -সূরা তাওবা, ১১৩

ওয়াল্লা-বারা ও জিহাদের মাসয়ালায় বড়দের এধরণের
বিচ্যুতি আমরা অহরহই দেখতে পাচ্ছি। তাই আমাদের
সতর্ক থাকতে হবে। তাঁদের প্রতি সম্মান বজায় রাখতে
হবে, তবে সেই সাথে মনে রাখতে হবে, তাদের আল্লাহ ও
তাঁর রাসূলের সম্মান তাদের সম্মানের চেয়েও বহুগুণ বেশী।
তাই সম্মান করতে গিয়ে তাদের অন্ধ-অনুসরণ করা যাবে
না। এটাই আল্লাহ তায়ালার পরীক্ষা। তিনি দেখতে
চাচ্ছেন, আমরা কি আমাদের বড়দের পূজা করি, না আল্লাহর
ইবাদত-আনুগত্য করি। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান
করুন।

১৯.মাওলানা আজিজুর রহমান খানের বই 'কালিমা তাইয়িবা'র উপর একটি আপত্তির বিস্তারিত জবাব

মাওলানা আজিজুর রহমান খানের বই 'কালিমা তাইয়িবা'র উপর এক ভাই একটা আপত্তি করেছিলেন। বিষয়টি আমার কাছে কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় নতুন খেঁড়ে উত্তর দিচ্ছি।

ভাইয়ের আপত্তি :-

আমার জানামতে বইটা আমাদের ইমারার ভাইদের কাছে জনপ্রিয়।

উক্ত বইয়ের ১২-১৩ পৃষ্ঠায় যা লেখা আছে, তা আমি হুবহু লিখে দিলাম। নিচের [] বন্ধনীর মাঝের লেখাটা।

[নফসকে ইলাহ মান্য করা:

এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা নিজের নফসকে ইলাহ হিসেবে মান্য করছে। পাঠকের হয়তো মনে হতে পারে যে নিজের নফস কিভাবে ইলাহ হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন -

أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ

আপনি কি তাদের দেখেছেন, যে নিজের প্রবৃত্তিকে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে। (সুরা ফুরকান, আয়াত :৪৩)

এ আয়াতে ইলাহ বলতে নিজের নফস বা নিজের ইচ্ছাশক্তিকে বুঝানো হয়েছে। নফসকে ইলাহ বানানোর অর্থ হচ্ছে নফসের দাসত্ব করা। মূলত: আল্লাহর আদেশকে অমান্য করে নিজের কামনা-বাসনা অনুযায়ী কাজ করার অর্থই হচ্ছে নফসকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করা। অর্থাৎ প্রবৃত্তির তাড়নায় আল্লাহর নির্দেশকে অমান্য করা বুঝায়। মূর্তি পূজা করা অথবা অন্য কোন কাউকে ইলাহ হিসেবে মান্য করলে যেভাবে শিরক হবে, নফসের দাসত্ব করা হলে তাও একই রকম শিরক হবে। হযরত আবু উমামা রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

"আসমানের নিচে আল্লাহ ছাড়া আর যত মাবুদের পূজা করা হয়, তন্মধ্যে আল্লাহর নিকট নিকৃষ্ট মাবুদ হচ্ছে নফসের খাহেশ যা অনুসরণ করা হয়"। বর্তমান সমাজে এরূপ লোকের সংখ্যাই বেশি, যারা নিজের কামনা-বাসনার গোলাম হয়ে হক এবং বাতিলের কোন পার্থক্য করে না, ন্যায় অন্যায়ের কোন তোয়াক্কা করে না। এ সকল মানুষ নিজের খেয়ালের বশবর্তী হয়ে অবলীলায় আল্লাহর হুকুমকে অমান্য

করে। এভাবেই এসকল লোকেরা নফসকে ইলাহের আসনে অধিষ্ঠিত করে।

একজন ব্যক্তি যখন আল্লাহর কোন নির্দেশের বিরুদ্ধে নিজের ইচ্ছাশক্তিকে প্রাধান্য দেয় তখন তার নফস ইলাহের পর্যায়ে চলে যায়।

যেমন আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে -সূদের লেনদেন করো না, ঘুষ নিয়ো না, ওজনে কম দিয়ো না, মজুতদারি করো না, ভেজাল দিয়ো না, কিংবা যিনার কাছে যেয়ো না। কিন্তু নফসের লোভ সামলাতে না পেরে মানুষেরা এ কাজগুলো করে। এ সকল অন্যায়গুলো করার জন্য নফস মানুষকে প্রলুব্ধ করে থাকে। তখন নফস ইলাহের পর্যায়ে পরে। যেমন, একজন কর্মচারীকে ঘুষ গ্রহণের জন্য নফস তাকে ভিতরে ভিতরে অভাবের যুক্তি দাড়া করায় কিংবা উন্নত জীবনের মোহ দেখায়। অতঃপর সে যখন কাজটি করে, তখন সে প্রবৃত্তি বা নফসকে আল্লাহর নিষেধের চেয়েও বেশি গুরুত্ব প্রদান করে এবং এভাবে নফসকে ইলাহের আসনে বসায় এবং কর্মের দ্বারা কালিমাকে অস্বীকার করে। এমনিভাবে নফস জীবনকে অন্যায়ভাবে উপভোগ করার চাহিদা দাড়া করিয়ে কোন ব্যক্তিকে যিনায় প্রলুব্ধ করে এবং কোন ব্যক্তি যখন এ কাজটি করে তখন সে আল্লাহর

হুকুমের চেয়েও নিজের নফসকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করে। ফলে তার নফস ইলাহের আসনে পর্যবসিত হয়। এভাবে নফসকে ইলাহ বানিয়ে কালিমাকে অস্বীকার করে। এভাবে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে নফসের তাড়নায় মানুষ যখন আল্লাহর কোন হুকুমকে অমান্য করে, তখন নফস তাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং আল্লাহর হুকুমের চেয়ে নিজের নফসকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করে। তখন নফস ইলাহের পর্যায়ে উপনীত হয়। ফলে সে শিরকের মধ্যে লিপ্ত হলো। কিংবা একশ্রেণীর শাসকরা যখন আল্লাহর বিধানের তোয়াক্কা না করে নিজের খেয়াল খুশি অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করে, তখন তাদের নফস ইলাহের পর্যায়ে পরে। কারণ তারা এক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুমের চেয়ে নিজের নফসকে বেশি প্রাধান্য দেয়। তারা তখন কালিমাকে অস্বীকার করল এবং শিরকের মধ্যে লিপ্ত হলো।

শিক্ষণীয়: নিজের খেয়ালের বশবর্তী হয়ে আল্লাহর কোন হুকুম অমান্য করার মাধ্যমে নিজের নফসকে ইলাহ বানানো হয় এবং "আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই" কালিমার এ বাণীকে কর্ম দ্বারা অস্বীকার করা হয়। এর মাধ্যমে ব্যক্তি কালিমার ঘোষণা থেকে সরে দাড়ায়, আল্লাহর সাথে শিরকে

লিগু হয়। তাই এ অবস্থা থেকে আমাদের সব সময় বেচে থাকতে হবে।]

আমার মনে হচ্ছে, লেখক এখানে যারা নফসের প্ররোচনায় গুনাহে লিগু হয়, তাদেরকে মুশরিক সাব্যস্ত করেছেন। আসলে বিষয়টা কি তাই?? নাকি আমি ভুল বুঝেছি?? দলিলসহ বিষয়টা খোলাসা করার অনুরোধ করছি।

আর লেখক যদি ভুল করে থাকেন, তাহলে বইটার হুকুম কি??এ বই প্রচার করার হুকুম কি??

উত্তর:- নফসের গোলামী করাও শিরক, তবে তা ছোট শিরক। এর কারণে কেউ ইসলাম থেকে বের হয়ে মুরতাদ হয়ে যায় না। কিন্তু যে নফসের গোলামী করে তার তাওহীদও পূর্ণাঙ্গ না, ত্রুটিযুক্ত। শায়েখ আজিজুর রহমান (ফক্বান্নাহ আসরাহ) মূলত এ বিষয়টিই বুঝাতে চেয়েছেন। আর এটা তার উল্লেখিত আয়াত, أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ، থেকে সুস্পষ্ট। কারণ কাউকে ইলাহ বানানো যে শিরক তা তো বলাইবাহুল্য। সুতরাং কেউ তার নফসকে ইলাহ বানালে সেটাও শিরক হবে। তবে সেটা হবে ছোট শিরক। শায়েখ

এ বিষয়টি খোলাসা করে দিলেই হয়তো ভালো হতো।
অবশ্য হতে পারে তিনি বিষয়টার ভয়াবহরূপে তুলে ধরার
জন্য খোলাসা করে বলেননি। যেমন একাধিক হাদিসে নামায
ত্যাগ, গণকের কাছে যাওয়া, যিনা, মদপান ইত্যাদি গুনাহকে
'তাগলীযান' কুফর-শিরক বলা হয়েছে। তাছাড়া শায়েখ
যেহেতু এর মধ্যে নিজেদের মনমতো আইনপ্রণয়নকারী
শাসকদেরও অন্তর্ভুক্ত করেছেন, আর নিঃসন্দেহে তাদের এ
কাজ শিরকে আকবর-বড় শিরক, এ কারণেও হয়তো
শায়েখ বিষয়টি খোলাসা করেননি।

এমনিতেই আমাদেরকে মুসলিমদের ব্যাপারে ভালো ধারণা
করার আদেশ করা হয়েছে, আর শায়েখ আজিজুর রহমানের
মতে বীরমুজাহিদ আলেমগণ, যারা তাগুতের সকল
চোখরাঙানি উপেক্ষা করে আমাদের নিকট সত্য দ্বীন
পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন, তাদের ব্যাপারে ভালো ধারণা
করা তো অতি জরুরী, তারা তো যমিনে আল্লাহ তায়ালার
'হুজ্জত-প্রমাণ' যারা না থাকলে আমরা পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের সন্ধান
পেতাম না। বিকৃত ও খণ্ডিত দ্বীনই আমাদের সামনে তুলে
ধরা হতো। উমর রাযি. বলেন,

لا تظنن بكلمة خرجت من في امرئ مسلم سوءا وانت تجد لها
في الخير محملا (مداراة الناس لابن أبي الدنيا ص: 50 رقم:

45)

“তোমার মুসলিম ভাইয়ের মুখ হতে বের হওয়া কোন শব্দের
ব্যাপারে তুমি খারাপ ধারণা করো না, যদি তুমি তার কোন
ভালো ব্যাখ্যা করতে পারো।” -মুদারাতুন নাস, ইবনু
আবিদ্দুনিয়া, পৃ: ৫০ হাদিস নং : ৪৫

উমর রাযি. আরো বলেন,

ضَعَّ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ حَتَّى يَأْتِيكَ مِنْهُ مَا يَغْلِبُكَ

তোমার ভাইয়ের বিষয়ে সর্বোত্তম ধারণাই পোষণ করো,
যতক্ষণ না তোমার নিকট এমন দলিল-প্রমাণ আসে যা
সুধারণা পোষণে তোমাকে অক্ষম করে দেয়। -আযযুহদ,
আবু দাউদ, পৃ: ৯৮ হাদিস নং : ৮৩

আর শায়েখ যে কথাগুলো বলেছেন, এগুলো তার
নবআবিষ্কৃত কোন কথা নয়। বরং পূর্ববর্তী আলেমগণও
এজাতীয় কথা বলে গেছেন। শায়েখ মূলত তাদের বক্তব্যের

সারমর্মই আমাদের নিকট নিজস্ব ভাষায় পেশ করতে
 চেয়েছেন। আমি উদাহরণস্বরূপ ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী
 (মৃত্যু: ৭৯৮ হি.) -এর একটি বক্তব্য তুলে ধরছি। দেখুন,
 শায়েখের বক্তব্যের সাথে তার বক্তব্যের কতই না মিল।
 ইবনে রজব হাম্বলী রহ. তাঁর কিতাব “কালিমা তুল ইখলাস
 ও তাহকিকু মা'নাহা” (কালিমায়ে তাইয়িবাহ ও তার অর্থের
 বাস্তবায়ন) এ তিনি বলেন,

إن قول العبد لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله له غير الله وإلله
 هو الذي يطاع فلا يعصى هيبه له وإجلالا ومحبة وخوفا
 ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له ولا يصلح ذلك كله
 إلا لله عز وجل فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور
 التي هي من خصائص الألهيته كان ذلك قدحا في إخلاصه في
 قول لا إله إلا الله ونقصا في توحيده وكان فيه من عبودية
 المخلوق بحسب ما فيه من ذلك وهذا كله من فروع الشرك
 ولهذا ورد إطلاق الكفر ولاشرك على كثر من المعاصي التي
 منشؤها من طاعة غير الله أو خوفه أو رجائه أو التوكل عليه
 والعمل لأجله كما ورد إطلاق الشرك على الرياء وعلى الحلف
 بغير الله وعلى التوكل على غير الله والإعتماد عليه وعلى من
 سوى بين الله وبين المخلوق في المشيئة مثل أن يقول ما شاء
 الله وشاء فلان وكذا قوله مالي إلا الله وأنت
 وكذلك ما يقدر في التوحيد وتفرد الله بالنعف والضر كالطيرة
 والرقي المكرومة وإيتان الكهان وتصديقهم بما يقولون

وكذلك اتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه قاذح في تمام التوحيد وكماله ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشؤها من هوى النفس أنها كفر وشرك كقتال المسلم ومن أتى حائضا أو امرأة في دبرها ومن شرب الخمر في المرة الرابعة وإن كان ذلك لا يخرج عن الملة ولهذا قال السلف كفردون كفر وشرك دون شرك

وقد ورد إطلاق الآله على الهوى المتبع قال الله تعالى {أفرأيت من اتخذ إلهه هواه} قال هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه وقال قتادة هو الذي كلما هوى شيئا ركبه وكلما اشتهى شيئا أتاه لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى وروي من حديث أبي أمامة باسناد ضعيف ما تحت ظل سماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع وفي حديث آخر لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن أصحابها حتى يؤثرون دنياهم على دينهم فاذا فعلوا ذلك ردت عليهم ويقال لهم كذبتم

ويشهد لذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتنقش فدل هذا على أن كل من أحب شيئا وأطاعه وكان غاية قصده ومطلوبه ووالي لأجله وعادى لأجله فهو عبده وكان ذلك الشيء معبوده وإلاهه

ويدل عليه أيضا أن الله تعالى سمي طاعة الشيطان في معصيته عبادة للشيطان كما قال تعالى {ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان} وقال تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم عليه السلام لأبيه {يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن

عصياً} فمن لم يتحقق بعبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد
الشیطان بطاعته له ولم یخلص من عبادة الشیطان إلا من
أخلص عبودية الرحمن وهم الذین قال فیهم {إن عبادي ليس لك
عليهم سلطان} فهم الذین حققوا قول لا إله إلا الله وأخلصوا في
قولها وصدقوا قولهم بفعلهم فلم یلتفتوا إلى غير الله محبة ورجاء
وخشية وطاعة وتوكلا وهم الذین صدقوا في قول لا إله إلا الله
وهم عباد الله حقا
فأما من قال لا إله إلا الله بلسانه ثم أطاع الشیطان وهواه في
معصية الله ومخالفته فقد كذب فعله وقوله ونقص من كمال
توحيدة بقدر معصية الله في طاعة الشیطان والهوى {ومن أضل
ممن اتبع هواه بغير هدى من الله} و {ولا تتبع الهوى فیضلك
عن سبيل الله} فیا هذا كن عبد الله لا عبد الهوى فان الهوى
یهوي بصاحبه في النار {أرباب متفرقون خیر أم الله الواحد
كلمة الإخلاص وتحقیق معناها الناشر: المكتب (القهار)
(1397الإسلامي - بیروت الطبعة: الرابعة،

“লা ইলাহা ইল্লাহ বলার দাবী হলো আল্লাহ ব্যতীত কোন
ইলাহ থাকবে না। আর ইলাহ তো তিনিই যার আনুগত্য
করা হয়, নাফরমানি করা হয় না, তার প্রতি সম্মান, ভয়,
মহব্বত, আশা, ভরসা এবং প্রার্থনার মাধ্যমে। আর এ
বিষয়গুলো শুধু আল্লাহ তায়ালার শানেই উপযোগী। যে এ

বিষয়গুলোতে কোন কিছুকে শরীক করবে তার লা ইলাহা ইল্লাহ বলা একনিষ্ঠ হবে না, তার তাওহীদ হবে অপূর্ণাঙ্গ এবং তার অবস্থা অনুপাতে সে মাখলুকের পূজারী হবে। আর এ সবগুলোই শিরকের শাখা। এজন্যই অনেক গুনাহকে কুফর-শিরক বলা হয়েছে, যে গুনাহগুলোর ভিত্তি হলো আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো আনুগত্য, ভয়, তার প্রতি আশা-ভরসা এবং এ জন্য আমল। যেমন লোকদেখানো আমল, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে কসম, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উপর ভরসা, ‘মাশাআল্লাহ ও শাআ ফুলানুন (আল্লাহ তায়াল্লা এবং অমুক যা চান)’ কিংবা ‘আমার জন্য আল্লাহ ও আপনি ব্যতীত কেউ নেই’- বলার মাধ্যমে আল্লাহ এবং বান্দাকে একই স্তরে নিয়ে আসা।

তেমনিভাবে যে বিষয়গুলো তাওহীদ এবং লাভ-ক্ষতির ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার- এ বিশ্বাসকে ত্রুটিযুক্ত করে, যেমন পাখির মাধ্যমে ভাগ্যগণনা, নাজায়েয ঝাড়-ফুক, গণকদের নিকট যাওয়া এবং তাদের কথা সত্য বলে বিশ্বাস করা,

তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার নিষিদ্ধ বিষয়াদিতে নফসের আনুগত্যও তাওহীদের পূর্ণতার প্রতিবন্ধক। এজন্যই শরিয়তে অনেক গুনাহকে কুফর-শিরক বলা হয়েছে যার উৎস হলো নফসের আনুগত্য। যেমন, মুসলিম ভাইয়ের সাথে যুদ্ধ, হয়েযা স্ত্রীর সাথে সহবাস, স্ত্রীর সাথে পায়ুপথে সহবাস, চারবার মদ পান করা, যদিও এ বিষয়গুলো তাকে ধর্ম থেকে বের করে দেয় না। এ কারণেই সালাফ বলেছেন, এগুলো কুফরুন দুনা কুফরুন, শিরকুন দুনা শিরকুন, অর্থাৎ ছোট শিরক।

যে নফসের আনুগত্য করা হয় তাকে ইলাহও বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, ‘তুমি কি সে ব্যক্তিকে দেখেছো, যে তার প্রবৃত্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে।’ আয়াতের তাফসীরে কাতাদাহ রহ. বলেন, সে হলো ঐ ব্যক্তি যে মন যা চায় তাই করে, আল্লাহর ভয় ও তাকওয়া তাকে এ থেকে বিরত রাখে না। আবু উমামা রাযি. এর সূত্রে একটি যয়ীফ হাদিসে এসেছে, ‘আসমানের নিচে আল্লাহ ছাড়া আর যত মাবুদের পূজা করা হয়, তন্মধ্যে আল্লাহর নিকট নিকৃষ্ট মাবুদ হচ্ছে নফসের খাহেশ যা অনুসরণ করা হয়।’ অপর হাদিসে এসেছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তার অনুসারীদের রক্ষা করে

যতক্ষণ না তারা স্বীনের উপর নিজেদের দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়। যখন তারা এটা করে তখন তাদের কালিমা প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং তাদেরকে বলা হয় তোমরা (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার ক্ষেত্রে) মিথ্যাবাদী।

একটি সহিহ হাদিস হতেও এ বিষয়টির সমর্থন মেলে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ধ্বংস হোক দিনারের গোলাম, ধ্বংস হোক দিরহামের গোলাম, ধ্বংস হোক ঝালরবিশিষ্ট নকশাদার চাদরের গোলাম, ধ্বংস হোক দামী পোশাকের গোলাম। সে ধ্বংস হোক, নিপাত যাক, তার পায়ে কাটা বিঁধলে কাটাও বের না হোক।’ [সহিহ বুখারী, ২৮৮৭ জামে’ তিরমিযি, ২৩৭৫] এ হাদিস প্রমাণ করে যে কোন জিনিষকে ভালোবাসবে, তার আনুগত্য করবে এবং সে জিনিষটিই তার পরম কামনা ও লক্ষ্য হবে, এর কারণেই সে কারো সাথে বন্ধুত্ব করবে, এর কারণেই সে কারো সাথে শত্রুতা করবে, সে ঐ জিনিষটার বান্দা বলে বিবেচিত হবে এবং সেই জিনিষটি তার ইলাহ ও উপাস্য হয়ে যাবে।

এ বিষয়ে আরো দলিল হলো, আল্লাহ তায়ালা তাঁর নাফরমানী করে শয়তানের আনুগত্য করাকে শয়তানের ইবাদত বলে সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘হে

বনী আদম, আমি কি তোমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নেইনি যে, তোমরা শয়তানের ইবাদত করবে না।’ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তার পিতাকে যা বলেছিলেন, আল্লাহ তায়ালা তা বর্ণনা করে বলেন, ‘হে আমার পিতা! আপনি শয়তানের ইবাদত করবেন না। নিশ্চয়ই শয়তান রহমানের অবাধ্য।’ সুতরাং যে রহমানের ইবাদত ও আনুগত্য করে না সে শয়তানের আনুগত্যের মাধ্যমে তার পূজারী হয়ে যাবে এবং শয়তানের পূজা হতে শুধু সেই মুক্ত থাকবে যে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তায়ালায় ইবাদত করবে। যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ‘আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই’। তারাই লা ইলাহা ইল্লাহর বাস্তবায়নকারী। তারা একনিষ্ঠভাবে এ কালিমা বলেছে এবং তাদের কাজ তাদের কথার সত্যায়ন করেছে। তারা মহব্বত, আশা, ভরসা, ভয় আনুগত্য কোন ক্ষেত্রেই গাইরুল্লাহর দিকে ঞ্ক্ষিপ করেনি। তারাই লা ইলাহা ইল্লাহ বলার ক্ষেত্রে সত্যবাদী। তারাই আল্লাহ তায়ালায় প্রকৃত বান্দা। পক্ষান্তরে যে মুখে লা ইলাহা ইল্লাহ বলে, এরপর আল্লাহ তায়ালায় নাফরমানী করে নফস ও শয়তানের আনুগত্য করে, তার কাজ তার কথাকে মিথ্যা প্রমাণ করে এবং নফস ও শয়তানের আনুগত্য অনুপাতে তার তাওহীদের মাঝে কমতি

আসে।

‘যে আল্লাহ তায়ালায় হেদায়েত ব্যতীত নফসের অনুসরণ করে তার অপেক্ষা বড় গোমরাহ আর কে আছে? ‘তুমি নফসের আনুগত্য করো না, তাহলে তা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে দিবে।’ সুতরাং হে মানুষ, তুমি আল্লাহর বান্দা হয়ে যাও, নফসের বান্দা হয়ো না। কেননা নফস তার বান্দাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। ‘ভিন্ন ভিন্ন অনেক ইলাহ উত্তম না প্রবল পরাক্রমশালী এক আল্লাহ’। - কালিমাতুল ইখলাস, পৃ: ২৩-২৮ আলমাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, চতুর্থ প্রকাশনা, ১৩৯৭ হি.

২০.মানবরচিত বিধান দ্বারা ফয়সালাকারী শাসকদের ব্যাপারে ইমামুল হারামাইন জুওয়াইনী রহ. এর ফতোয়া

ইমামুল হারামাইন আব্দুল মালিক বিন আব্দুল্লাহ আবুল মাআলী আলজুওয়াইনী রহ. (মৃত্যু: ৪৭৮)। শাফেয়ী মাযহাবের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব। সালজুকী সালতানাতে বিখ্যাত উযির নেযামুল মুলক তুসীর প্রতিষ্ঠিত ইসলামের ইতিহাসের সর্বপ্রথম প্রচলিত মাদ্রাসা ‘মাদ্রাসায়ে নেযামিয়া’র প্রধান

শিক্ষক। ইমাম আবু ইসহাক সিরাজী তাকে ইমামুল
আয়িম্মাহ বা ইমামদের ইমাম বলে সম্বোধন করতেন।
শাফেয়ী মাযহাবকে সুবিন্যস্তরূপে পেশ করার ক্ষেত্রে তার
অবদান সুস্বীকৃত। (আলবিদায়া ওয়াননিহায়া, ১৬/৯৬
আলমাদখাল ইলা দিরাসাতিল মাযাহিবিল ফিকহিয়াহ, *পৃ:
৪১)

তার যুগে মানুষের মাঝে একটা ভুল ধারণা ছড়িয়ে পড়ে।
অনেকেই মনে করতে থাকে, শরিয়তের নির্ধারিত শাস্তি
মানুষকে অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখার জন্য যথেষ্ট না,
তাই অন্যায়ের শাস্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ইমামুল
হারামাইন তাদের এই ধারণার তীব্র সমালোচনা করেন,
অত্যন্ত জোরালোভাষায় তা খন্ডন করেন। এমনকি
একপর্যায়ে তিনি বলেন,

وما أقرب هذا المسلك من عقْد من يتَّخذُ سننَ الأكاسرة والملوك
المُنقرضين عمدة الدين، ومن تشبَّث بهذا، فقد انسلَّ عن رِبقة
الدين انسلالَ الشعرة عن العجين. (غياث الأمم في التياث الظلم،
(الناشر: مكتبة إمام الحرمين، الطبعة: الثانية، 1401هـ).

“এই মতবাদটা ঐ লোকদের কাজের কতই না নিকটবর্তী
যারা পূর্ববর্তী কায়সার ও অন্যান্য বাদশাদের রীতিনীতি ও
আইনকানুনকে দ্বীনের ভিত্তি রূপে গ্রহণ করে। আর যে

এরূপ করবে সে তো দ্বীনের গন্ডি থেকেই বের হয়ে যাবে,
যেমনভাবে খামিরা থেকে চুল বের হয়।” (অর্থাৎ
যেমনভাবে খামিরা থেকে বের করা চুলের মাঝে আটার
কোন অংশ লেগে থাকে না, তেমনভাবে তার মাঝেও দ্বীনের
কোন অংশ থাকবে না, সে কাফের-মুরতাদ হয়ে যাবে।) -
গিয়াসুল উমাম, পৃ: ২২২ আরো দেখুন, পৃ: ২০০

শায়েখ আব্দুর রহমান বিন সালাহ আলমাহমুদ ইমামুল
হারামাইনের বক্তব্য উদ্ধৃত করে এর টীকায় লিখেন,

وما أشبه كلام الجويني هذا بالقوانين الوضعية التي انتشرت
بين المسلمين، فإنها شرائع وقوانين الغرب الكافر من نصارى
وغيرهم، وقد حكم الجويني على من يتخذ سنن الأكاسرة مرجعا
وعمدة في الدين بالكفر والخروج من الدين. (الحكم بغير ما
أنزل الله : أحواله وأحكامه ص 271

“ইমাম জুওয়াইনীৰ বক্তব্য মুসলমানদের মাঝে বিস্তার লাভ
করা মানবরচিত বিধানের সাথে কতইনা মিলে যায়। কেননা
এগুলো পশ্চিমা খৃষ্টান ও অন্যান্য কাফেরদের বিধান,
রীতিনীতি ও আইনকানুন। আর যে কায়সারদের রীতিনীতি
ও আইনকানুনকে দ্বীনের ভিত্তি বানায় ইমাম জুওয়াইনীৰ
বক্তব্য অনুযায়ী সে কাফের ও মুরতাদ হয়ে যায়।” -
আলহুকমু বিগাইরি মা আনযালাল্লাহ ,পৃ: ২৭১

২১. মুনাফিকদের জিহাদ পরিত্যাগের কিছু অসার অজুহাত

জিহাদ হলো ইমানের কষ্টিপাথর। কষ্টিপাথরের মাধ্যমে যেমন খাঁটি ও ভেজাল স্বর্ণের মধ্যে পার্থক্য করা যায়, আল্লাহ তায়ালাও জিহাদের মাধ্যমে মুমিনদের ইমান পরীক্ষা করেন, তারা কি আসলেই আল্লাহ তায়ালাকে বেশি ভালোবাসে না কি নিজেদের জান-মাল, স্ত্রী-সন্তান, সাজানো ঘরবাড়ি ও কষ্ট-ঘামে গড়ে তোলা ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্ষেত-খামারকে বেশি ভালোবাসে। নতুবা মুখে আল্লাহ তায়ালায় ইশক ও ভালোবাসার দাবী তো যে কেউ করতে পারে।

তো যেহেতু জিহাদ একটি কষ্টকর পরীক্ষা, তাই এ পরীক্ষা হতে বাঁচার জন্য মুনাফিকরা সবসময়ই বিভিন্ন অজুহাত তৈরি করতে থাকে। আল্লাহ তায়ালা সেই ভ্রান্ত অজুহাতগুলো কুরআনে বর্ণনা করে দিয়েছেন, যেন মুমিনরা এ ধরনের অজুহাতে জিহাদ পরিত্যাগ হতে বিরত থাকে এবং এই অজুহাতগুলো পেশ করে কেউ তাদেরকে জিহাদ হতে নিবৃত্ত না করতে পারে। আমরা এ ধরনের কিছু অজুহাত নিয়েই আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। **সচেতন পাঠক লক্ষ্য করবেন, বর্তমানে উলামায়ে সু জিহাদের বিরোধিতার জন্য**

যে সকল অজুহাত দাঁড় করাচ্ছে তা অবিকল কুরআনে বর্ণিত
মুনাফিকদেরই অজুহাত!

১. জিহাদকে ফেতনা-ফাসাদের কারণ মনে করা। এখন
যতটুকু দ্বীন পালন করতে পারছি, জিহাদ করতে গেলে
ততটুকুও পালন করতে পারবো না বলে দাবী করা। আল্লাহ
তায়াল্লা বলেন,

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَاِنَّ
جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكَافِرِيْنَ

‘আর তাদের মধ্যেই সেই ব্যক্তিও আছে, যে বলে, আমাকে
অব্যাহতি দিন এবং আমাকে ফিতনায় ফেলবেন না। ওহে!
ফিতনায় তো তারা পড়েই রয়েছে। বিশ্বাস রাখো, জাহান্নাম
কাফেরদেরকে বেষ্টিত করে রাখবেই।’ -সূরা তাওবা: ৪৯

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. বলেন,

ولما كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في
سبيل الله من الابتلاء والمحن ما يعرض به المرء للفتنة: صار
في الناس من يتعلل لترك ما وجب عليه من ذلك بأنه يطلب
السلامة من الفتنة كما قال عن المنافقين: {ومنهم من يقول ائذن
لي ولا تفتني اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا} الآية. وقد ذكر في التفسير

أنها نزلت في {الجد بن قيس لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتجهز لغزو الروم - وأظنه قال: هل لك في نساء بني الأصفر؟ - فقال يا رسول الله: إني رجل لا أصبر عن النساء؛ فائذن لي ولا تفتني} . . وإني أخاف الفتنة بنساء بني الأصفر وهذا الجد هو الذي تخلف عن بيعة الرضوان تحت الشجرة؛ واستتر بجمل أحمر؛ وجاء فيه الحديث: {أن كلهم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر فأنزل الله تعالى فيه: {ومنهم من يقول انذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا}} . يقول: إنه طلب القعود ليسلم من فتنة النساء فلا يفتن بهن فيحتاج إلى الاحتراز من المحذور ومجاهدة نفسه عنه فيتعذب بذلك أو يواقعه فيأثم؛ فإن من رأى الصور الجميلة وأحبها فإن لم يتمكن منها إما لتحريم الشارع وإما للعجز عنها يعذب قلبه وإن قدر عليها وفي الحلال من ذلك من معالجة النساء . وفعل المحذور هلك ما فيه بلاء. فهذا وجه قوله: {ولا تفتني} قال الله تعالى: {ألا في الفتنة سقطوا} يقول نفس إعراضه عن الجهاد الواجب ونكوله عنه وضعف إيمانه ومرض قلبه الذي زين له ترك الجهاد: فتنة عظيمة قد سقط فيها فكيف يطلب التخلص من فتنة صغيرة لم تصبه بوقوعه في فتنة عظيمة قد أصابته؟ والله يقول: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله} . فمن ترك القتال الذي أمر الله به لئلا تكون فتنة: فهو في الفتنة ساقط بما وقع فيه من ريب قلبه ومرض فؤاده وتركه ما أمر الله به من الجهاد (مجموع الفتاوى: 28 / 165)

'যেহেতু আমার বিল মারুফ, নাহি আনিল মুনকার ও জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহয় অনেক কষ্ট ও পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়

তাই কেউ কেউ ফিতনা হতে বাঁচার অজুহাতে এ আমলগুলো পরিত্যাগ করতে চায়। যেমনটা আল্লাহ তায়ালা মুনাফিকদের ব্যাপারে বলেছেন, ‘তাদের মধ্যেই সেই ব্যক্তিও আছে, যে বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং আমাকে ফিতনায় ফেলবেন না।’ আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে, আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে, জাদ বিন কায়েসের ব্যাপারে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন, তোমার কি রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণের ইচ্ছা আছে? সে বললো, আমি তো নারী দেখলে ঠিক থাকতে পারি না, আমার আশংকা হয় আমি রোমান নারীদের দ্বারা ফিতনার শিকার হবো। সুতরাং আপনি আমাকে জিহাদে না যাবার অনুমতি দিন, আমাকে ফেতনায় ফেলবেন না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘ফিতনায় তো তারা পড়েই রয়েছে’ অর্থাৎ ফরয জিহাদ হতে তাদের মুখ ফিরিয়ে নেয়া, তাদের ইমানের দুর্বলতা ও অন্তরের ব্যাধি যা তাদের জন্য জিহাদ পরিত্যাগ করাকে সুসজ্জিত করেছে, এগুলোই হলো বড় ফিতনা যাতে তারা নিমজ্জিত রয়েছে, তাহলে যে বড় ফেতনায় সে পড়ে আছে তার বদলায় সেই ছোটখাটো ফেতনা হতে সে কিভাবে বাঁচতে চাইতে পারে, যাতে সে এখনো পড়েইনি? আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘তোমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো, যাবত না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হয়ে যায়।’ (সূরা

আনফাল: ৩৯) সুতরাং যে ফিতনা না হওয়ার জন্য আল্লাহর তায়ালার আদিষ্ট জিহাদ ছেড়ে দেয়, সে অন্তরের সংশয় ও ব্যাধি এবং ফরয জিহাদ পরিত্যাগের কারণে ফিতনায় পড়েই আছে। -মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/১৬৫

২. জিহাদের সামর্থ্য নেই বলে বসে থাকা। জিহাদ না করা এবং জিহাদের জন্য প্রস্তুতিও না নেয়া:-

যে মুনাফিকরা তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়াল্লা বলেন,

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَنْهُمْ
الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

‘যদি পার্শ্ববর্তী সামগ্রী আশু লাভের সম্ভাবনা থাকতো এবং সফরও মাঝামাঝি রকমের হতো, তবে তারা (অর্থাৎ মুনাফিকরা) অবশ্যই তোমাদের অনুগামী হত। কিন্তু তাদের পক্ষে এই কঠিন পথ অনেক দূরবর্তী মনে হলো। এখন তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলবে, আমাদের সামর্থ্য থাকলে অবশ্যই আপনার সাথে বের হতাম। তারা নিজেরা নিজেদেরকেই ধ্বংস করেছে এবং আল্লাহ ভালো করেই জানেন তারা মিথ্যাবাদী।’ -সূরা তাওবা: ৪২

এর কিছু পরে আল্লাহ তায়াল্লা বলেন,

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاتَهُمْ
فَتَبَيَّنَتْ لَهُمْ وَقِيلَ لَهُمْ قَاتِلُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ

‘যদি বের হওয়ার ইচ্ছাই তাদের থাকত, তবে তার জন্য কিছু না কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করত। কিন্তু তাদের ওঠাই আল্লাহর পছন্দ না। তাই তাদেরকে আলস্যে পড়ে থাকতে দিলেন এবং বলে দেয়া হলো, যারা (পঙ্গুত্বের কারণে) বসে আছে তাদের সাথে তোমরাও বসে থাকো।’ -সূরা তাওবা:

৪৬

আল্লামা তাকী উসমানী দা.বা. বলেন, এ আয়াত জানাচ্ছে যে, মানুষের ওজর-অজুহাত কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে, যখন নিজের পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালনের পুরোপুরি চেষ্টা ও সাধ্যমত প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তারপর তার সামনে তার ইচ্ছা-বহির্ভূত এমন কোনও কারণ এসে পড়ে, যদ্বরণ সে নিজ দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয় না। পক্ষান্তরে কোনো লোক যদি চেষ্টাই না করে এবং সাধ্য অনুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ থেকে বিরত থাকে আর এ অবস্থায় বলে, আমি অক্ষম, আমার ওজর আছে, তবে তার এ কথা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। -তাওযীহুল কুরআন: ১/৫৪২

৩. জিহাদকে অদূরদর্শিতা বলে দাবী করা:-

মুনাফিকদের আরেকটি অভ্যাস হলো তারা ভীরুতার কারণে জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে, কিন্তু নিজেদের ভীরুতা স্বীকারও করতে চায় না। তাই জিহাদ না করাকে ওরা দূরদর্শিতা হিসেবে প্রমাণ করতে চায়। উহুদ যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার পর মুনাফিকরা মারামপথ হতে এ কথা বলে ফিরে এসেছিল,

لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبِعْنَاكُمْ

‘আমরা যদি দেখতাম (যুদ্ধের মতো) যুদ্ধ হবে, তবে অবশ্যই তোমাদের পেছনে চলতাম।’ -সূরা আলে ইমরান: ১৬৭

আল্লামা তাকী উসমানী দা. বা. বলেন, ‘তারা বলতে চাচ্ছিল যে, এটা সমানে-সমানে যুদ্ধ হলে আমরা অবশ্যই এতে শরীক হতাম, কিন্তু এটাতো অসম যুদ্ধ। শত্রুসংখ্যা তিন গুনেরও বেশি। কাজেই এটা যুদ্ধ নয়, আত্মহত্যা। এতে আমরা শরীক হতে পারি না।’ -তাওযীহুল কুরআন: ১/২১৯
যেহেতু মুনাফিকরা জিহাদকে অদূরদর্শিতা হিসেবে প্রমাণ করতে চায় তাই মুজাহিদরা পরাজিত হলেই তারা খুশি হয় এবং একে নিজেদের দূরদর্শিতার প্রমাণরূপে পেশ করে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا
[التوبة: 50] أَمْرًا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ

‘তোমাদের কোন কল্যাণ লাভ হলে তাদের দুঃখ হয় আর
যদি তোমাদের কোন মুসিবত দেখা দেয়, তবে বলে, আমরা
তো আগেই সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম আর (একথা
বলে) তার বড় খুশি মনে সটকে পড়ে। -সূরা তাওবা: ৫০

আয়াতের তাফসীরে আল্লামা শিব্বির আহমদ উসমানী রহ.
বলেন,

منافقين کی عادت تھی جب مسلمانوں کو غلبہ کامیابی نصیب
ہوتی تو جلتے اور کڑھتے تھے۔ اور اگر کبھی کوئی سختی
کی بات پیش آگئی مثلاً کچھ مسلمان شہید یا مجروح ہو گئے۔
تو فخریہ کہتے کہ ہم نے ازراہ دور اندیشی پہلے ہی اپنے
بچاؤ کا انتظام کر لیا تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہی حشر
ہونے والا ہے لہذا ان کے ساتھ گئے ہی نہیں۔ غرض ڈینگیں
مارتے ہوئے اور خوشی سے بغلیں بجاتے ہوئے اپنی
مجلسوں سے گھروں کو واپس جاتے ہیں۔

‘মুনাফিকদের অভ্যাস ছিল, মুসলমানরা যুদ্ধে বিজয়ী হলে
তাদের গা জ্বলত। কিন্তু যদি কখনো মুসলমানদের উপর
কোন বিপদ আসতো, যেমন কিছু মুসলমান শহিদ হয়ে
যেতো কিংবা আহত হতো তাহলে তারা অহংকার করে

বলতো, আমরা তো দূরদর্শিতার কারণে পূর্বেই নিজেদের রক্ষার ব্যবস্থা করে নিয়েছিলাম। আমরা জানতাম এমনটাই ঘটবে। তাই তো তাদের সাথে যুদ্ধে যাইনি। সারকথা হলো, তারা অত্যন্ত আত্মতৃপ্তি নিয়ে আনন্দ-উল্লাস করতে করতে মজলিস হতে ঘরে ফিরে যায়।' -তফসীরে উসমানী।

২২. মূর্তিসংহারক হতে প্রতিমাপ্রহরী; আমাদের বিভ্রান্তির শেষ কোথায়?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়াতে প্রেরণের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হলো, মূর্তিসংহার, প্রতিমাভঙ্গন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أرسلني بصلّة الأرحام، وكسر الأوثان

‘আল্লাহ তায়ালা আমাকে প্রেরণ করেছেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ও মূর্তি ভাঙ্গার আদেশ দিয়ে।’ -সহিহ মুসলিম, ৮৩২। মক্কা বিজয়ের পর রাসূল নিজে কাবা শরিফে রাখা ৩৬০ মূর্তি ভাঙ্গেন। -সহিহ বুখারী, ২৪৭৮ সহিহ মুসলিম, ১৭৮০। মদীনায় একটি স্থিতিশীল ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে তোলার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু মূর্তি ভাঙ্গার জন্য দিকে দিকে বাহিনী প্রেরণ

করেছিলেন। ইয়ামানের সবচেয়ে বড় মন্দির ‘যিল খালাসা’কে ভাঙ্গার জন্য নবীজি জারীর বিন আব্দুল্লাহ বাজালীর নেতৃত্বে দেড়শো ঘোড়সওয়ারের বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। -সহিহ বুখারী, ৪৩৫৬ সহিহ মুসলিম, ২৪৭৬।

আলী রাযি. বলেন, “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম আমাকে এ আদেশ দিয়ে পাঠান যে, আমার সামনে যত মূর্তি পড়বে সব ধ্বংস করে ফেলবো এবং সব উঁচু কবর মাটির সাথে মিশিয়ে সমান করে দিবো। -সহিহ মুসলিম, ৯৬৯।

মক্কা বিজয়ের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘উযযা’কে ভাঙ্গার জন্য খালিদ বিন ওয়ালীদের নেতৃত্বে ত্রিশজন অশ্বারোহী প্রেরণ করেন। ‘লাত’কে ভাঙ্গার জন্য মুগিরাহ বিন শোবা ও আবু সুফিয়ান রাযি. কে প্রেরণ করেন। ‘মানাত’কে ভাঙ্গার জন্য বিশজন অশ্বারোহী সহ সা’দ বিন যায়েদ আশহালীকে পাঠান। ‘হুযাইল’ গোত্রের মূর্তি ভাঙ্গার জন্য প্রেরণ করেন আমর বিন আসকে। ‘তাই’ গোত্রের মূর্তি ভাঙ্গার জন্য প্রেরণ করেন আলী রাযি. কে। তোফায়েল বিন আমর দাউসীকে প্রেরণ করেন আমর বিন হুমামার মূর্তি ভাঙ্গার জন্য। তিনি সে মূর্তিটা ভেঙ্গে আঙুনে পুড়িয়ে দেন। -নাসায়ী, আসসুনানুল কুবরা, ১১৪৮৩

মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০২৫৫ তবাকাতু ইবনি সা’দ, ১/২৪৩; ২/১১০-১১২; ৪/১৮১ ৭/৩৪২ যাদুল মাআদ, ইবনুল কাইয়িম, ৩/৫২৩।

রাসূল যে শুধু ক্ষমতা হাতে পাবার পরেই মূর্তি ভেঙ্গেছিলেন এমন নয়, বরং মক্কায় থাকাকালীন সময়েও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাযি. এর সহায়তায় কাবা শরিফের উপরে স্থাপিত মূর্তি ফেলে দিয়ে ভেঙ্গেছিলেন। - মুসনাদে আহমদ, ৬৪৪ মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯৮৩৬

আর রাসূল কেনই বা মূর্তি ভাঙ্গবেন না? রাসূল তো বংশ ও আদর্শ উভয় দিক দিয়ে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের উত্তরসূরী। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কিভাবে মূর্তি ভেঙ্গেছিলেন, এ জন্য কি কি কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, এর বিস্তারিত বিবরণ তো কুরআনেই রয়েছে। অথচ তখন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কাফেরদের মাঝে অতি দুর্বল অবস্থায় ছিলেন। এমনকি মূর্তি ভাঙ্গার অপরাধে (?) কাফেররা তাকে আগুনে নিক্ষেপও করেছিল। বলাবাহুল্য, এ সব কিছু কুরআন আমাদের জন্য আদর্শ হিসেবেই পেশ করেছে। -দেখুন, সূরা আলআশ্বিয়া, ৫৭-৭০ সূরা সাফফাত, ৮৮-৯৮

নবীদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিজয়ী সাহাবী ও আমীরগণ মূর্তি ভেঙ্গেছেন। আব্দুর রহমান বিন সামুরাহ রাযি. সিজিস্তান বিজয় করার পর মূর্তি ভাঙ্গেন। -মুজামুল বুলদান, ২/৪৩৪।

মাহমুদ গযনবী রহ. সোমনাথের সবচেয়ে বড় মূর্তি ভাঙ্গেন।
-আলবিদায়া ওয়াননিহায়া, ৬/২২৩। জানি না, বর্তমান মুসলিমরা এই মূর্তি ভাঙ্গাকে ভালো মনে করেন, মোল্লা উমরের বৌদ্ধমূর্তি ভাঙ্গা নিয়ে তারা যে শোরগোল করেছেন, এতে মনে হয় তারা বিশ্বাস করেন যে, মাহমুদ গযনবী আসলেই ডাকাত ও লুটেরা ছিলেন, হিন্দুস্তানের সম্পদ লুট করার জন্যই তিনি হিন্দুস্তানে বারবার আক্রমণ করেছেন, যেমনটা বর্তমানে স্কুলের বইয়ে পড়ানো হয়। অথচ মাহমুদ গযনবী, মুহাম্মদ ঘুরী ও বখতিয়ার খিলজীর জিহাদের কল্যাণেই তো আমরা ইসলাম পেয়েছি। তা না হলে তো আজও আমরা মালাউনই থেকে যেতাম। সুতরাং তাদের ডাকাত বলে, ইসলামে আক্রমণাত্মক জিহাদ নেই বলে কি আমরা নিজেদের মুসলিম হওয়ার পথ ও পদ্ধতিকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলছি না? যদি মুসলিম হওয়ার প্রকৃত মূল্য আমরা উপলব্ধি করে থাকি তাহলে এ ধরনের বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের পুনরায় চিন্তা করা দরকার।

আসলে আজ আমরা কুরআন-হাদিস থেকে দূরে সরে পড়ছি। তাই যে যেভাবে ইচ্ছা আমাদের বিভ্রান্ত করছে। আজ কুরআনের সুস্পষ্ট আদেশ অমান্য করে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভালোবাসার নামে মুসলিম-কাফের গলাগলি করছে। শুধু তাই নয়, বরং এ সম্প্রীতির চূড়ান্ত প্রকাশ রূপে

মুসলিমরা মন্দির পাহারা দিচ্ছে। ইতিপূর্বে হাটহাজারী
মাদ্রাসার ছাত্ররা মন্দির পাহারা দিয়েছিল। তা নিয়ে জাতির
কর্ণধার আলেমগণ গর্বও করেছিলেন। আজ দেখলাম উত্তর
দিল্লীর মুসলিমরাও মন্দির পাহারা দিচ্ছে। আগামীকাল
হয়তো দেখবো, মন্দির পাহারা দিতে গিয়ে নিহত
মুসলিমদের শহিদও বলা হচ্ছে।

ভারতের মুসলিমরা হয়তো ভেবেছেন, হিন্দুরা নিজেরাই
ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মূর্তি ভেঙ্গে মুসলিমদের উপর দোষ
চাপাবেন। তাই তারা মন্দির পাহারা দিচ্ছেন। কিন্তু মন্দির
রক্ষা করতে পারলেই কি হিন্দুরা বসে থাকবে? এভাবেই কি
হিন্দুদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে? আসলে কুরআন-
হাদিস থেকে দূরে থাকলে চিরদিনই এভাবে বোকা বনতে
হবে। আফসোস, মুসলমানরা এখনও কাফেরদের সাথে
ভালোবাসা-সম্প্রীতির মাধ্যমে সুখে-শান্তিতে থাকার দিবা-স্বপ্ন
দেখছে। অথচ আল্লাহর তায়াল্লা তাদের বারবার সতর্ক করে
বলেছেন, ‘কাফেররা কখনোই মুসলিমদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে
না।’ ‘তারা সর্বদা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করতেই থাকবে,
যতক্ষণ না মুসলিমরা তাদের ধর্ম থেকে ফিরে যায়।’ ‘তারা
চায় তোমরাও কুফরী করো, যেমনিভাবে তারা কুফরী
করেছে।’ ‘তারা তোমাদের ক্ষতি করতে কোন ক্রটি করবে
না। তোমাদের কষ্টই তাদের পছন্দনীয়। তোমরা তাদের

মহব্বত করলেও তারা তোমাদের মহব্বত করে না।’
 ‘সুযোগ পেলে তারা তোমাদের কচুকাটা করবে। এমনকি
 তোমাদের ব্যাপারে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক কিংবা কোন
 শান্তিচুক্তির পরোয়াও করবে না। ওরা মিষ্টি মিষ্টি বুলি দিয়ে
 তোমাদের মন ভুলায়, কিন্তু তাদের অন্তর তোমাদের মহব্বত
 করতে অস্বীকার করে।’ (দেখুন, সূরা বাকারা, ১২০ ও ২১৭
 সূরা আলে ইমরান, ১১৭-১১৮ সূরা নিসা, ৮৯ সূরা তাওবাহ,
 ৮ সূরা মুমতাহিনাহ, ২)

ভারতের মুসলিম সহ সারা দুনিয়ার মুসলমানদের চিন্তা করা
 দরকার, কুরআন-হাদীস হতে সরে গিয়ে আমরা কোন পথে
 হাটছি? এ পথ আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে? কুরআন-
 সুন্নাহ বিরোধী এ ধরণের কর্মপদ্ধতি না আমাদের দুনিয়াতে
 মুক্তি দিবে না আখেরাতে। নির্যাতিত মুসলিমদের মুক্তির পথ
 তো একটিই। আল্লাহর পথে সশস্ত্র জিহাদ। আল্লাহ তায়ালা
 বলেন,

{ أذنَ لِلَّذِينَ يُفَاتِنُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ }
 [الحج: 39]

“যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদেরকে অনুমতি দেওয়া
 যাচ্ছে (তারা নিজেদের প্রতিরক্ষার্থে যুদ্ধ করতে পারে)।

যেহেতু তাদের প্রতি যুলুম করা হয়েছে। নিশ্চিত জেনে রেখ,
আল্লাহ তাদেরকে জয়যুক্ত করতে পরিপূর্ণ সক্ষম।” -সূরা
হাজ্জ, ৩৯

খেলাফতের দ্বায়িত্ব লাভের পর প্রদত্ত সর্বপ্রথম ভাষণে আবু
বকর রাযিআল্লাহু আনহু বলেন,

لَا يَدْعُ قَوْمٌ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا ضَرَبَهُمُ اللَّهُ بِالذَّلِّ، وَلَا تَسْبِيحُ
رواه ابن إسحاق في الفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ
السيرة، قال: وحدثني الزهري، قال: حدثني أنس بن مالك، قال:
لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد، جلس أبو بكر على
دار الكتب العلمية) وقال ابن كثير في المنبر، (ص: 718 ط
البداية والنهاية (5/248 ط. دار الفكر): وهذا إسناد صحيح

“যে জাতিই জিহাদ পরিত্যাগ করে আল্লাহ তায়ালা তাদের
উপরই লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেন, আর যে জাতির মাঝেই
অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে আল্লাহ তাদের (নেককার ও বদকার
সবাইকেই) ব্যাপকভাবে শাস্তি দেন।” -সীরাতে ইবনে
ইসহাক, পৃ: ৭১৮, ইবনে কাসীর রহিমাল্লাহু আলবিদায়া
ওয়াননিহায়াতে (৫/২৪৮) এই হাদিসটির সনদকে সহিহ
বলেছেন।

২৩.রাসূল আমাদের জন্য এতটা করলেন, কিন্তু আমরা ...?

عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم: تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: {رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني} [إبراهيم: 36] الآية، وقال عيسى عليه السلام: {إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك المائدة: 118}، فرفع يديه وقال: «اللهم [أنت العزيز الحكيم] أمتي أمتي»، وبكى، فقال الله عز وجل: «يا جبريل اذهب إلى محمد، وربك أعلم، فسله ما يبكيك؟» فأثاه جبريل عليه الصلاة والسلام، فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال، وهو أعلم، فقال الله: " يا جبريل، اذهب إلى محمد، فقل: إنا (202) سنرضيك في أمتك، ولا نسوءك. صحيح مسلم

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু আল আস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্* তায়ালা কুরআনে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর দোয়া বর্ণনা করেন: (অর্থ) হে আমার প্রতিপালক! এ সকল প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে, সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে, সে আমার দলভুক্ত, কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু” (১৪ঃ ৩৬)। আর ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর দোয়া বর্ণনা করেছেন: (অর্থ) “তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও, তবে তারা তো তোমারই বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়”

(৫ঃ ১১৮)।

তারপর তিনি তাঁর উভয় হাত উঠালেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! আমার উম্মত, আমার উম্মত! আর কেঁদে ফেললেন। তখন মহান আল্লাহ বললেন: হে জিবরীল! মুহাম্মদের কাছে যাও, তোমার রব তো সবই জানেন, তাঁকে জিজ্ঞেস কর, তিনি কাঁদছেন কেন? জিবরীল (আলাইহিস সালাম) এসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছিলেন, তা তাঁকে অবহিত করলেন। আর আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন: **হে জিবরীল! তুমি মুহাম্মাদের কাছে যাও এবং তাঁকে বল, আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করে দেব, আপনাকে অসন্তুষ্ট করব না।** -সহিহ মুসলিম: ২০২

ইমাম নববী রহ. হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করে দেব, আপনাকে অসন্তুষ্ট করব না’ এর অর্থ হলো আপনার পুরো উম্মতকে জাহান্নাম হতে মুক্ত করে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। -শরহ মুসলিম: ৩/৭৮

এ হাদিস থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে কতটা ভাবতেন, তিনি আমাদের মুক্তির জন্য কতটা ব্যাকুল ছিলেন। প্রত্যেক নবীকেই আল্লাহ তায়ালা একটি দুয়া কবুলের

গ্যারান্টি দিয়েছিলেন। তারা সেই দোয়া দুনিয়াতেই করে ফেলেছেন। কিন্তু আমাদের নবী তার দোয়াটি এমন কবীরা গুনাহকারীদের জন্য সংরক্ষিত রেখেছেন, যারা তাকে রাসূল হিসেবে মানে এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ের হলেও নবীজির প্রতি তাদের ভালোবাসা রয়েছে। আহ! আমাদের ইমানের দুর্বলতার কারণে নবীজিকে যেভাবে ভালোবাসা দরকার সেভাবে আমরা ভালবাসতে পারিনা, রাসূলের অনুসরণ করিনা। কিন্তু তাই বলে নবীজি আমাদেরকে শাফায়াত থেকে বঞ্চিত করেননি। বরং আমাদের মতো কবীরা গুনাহকারীদের জন্যই তিনি তার মাকবুল দোয়াটি সংরক্ষিত রেখেছেন!!! সুবহানাল্লাহ! ভাবা যায়? ফিদাকা আবী ওয়া উম্মী ইয়া রাসূলুল্লাহ।

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإنني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً». صحيح البخاري (6304)
(199) صحيح مسلم

আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: প্রত্যেক নাবীর জন্য একটি বিশেষ দোয়া আছে যা অবশ্যই কবুল হবে। সকলেই তাদের দোয়া পৃথিবীতেই করে নিয়েছেন। আমি আমার

দোয়াটি কিয়ামত দিবসে আমার উম্মতের জন্য রেখে
 দিয়েছি। আমার উম্মতের যে ব্যক্তি কোন প্রকার শিরক না
 করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে সে ইনশাআল্লাহ আমার এ
 দোয়া লাভ করবে। -সহিহ বুখারী: ৬৩০৪; সহিহ মুসলিম:
 ১৯৯

عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي
 لأهل الكبائر من أمتي. رواه الترمذي (2435) وقال: هذا حديث
 حسن صحيح، ثم رواه (2436) من حديث محمد بن علي، عن
 جابر بن عبد الله، وزاد فيه أن جابر قال لمحمد: يا محمد، من
 لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة؟

আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
 ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমার শাফা‘আত হল আমার উম্মতের
 কবীরা গুনাহকারীদের জন্য। -জামে তিরমিযি: ২৪৩৫
 জাবের রাযি. থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। সেখানে
 জাবের রাযি. বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবন আলী রহ. কে বলেন:
 হে মুহাম্মদ, যে ব্যক্তি কবীরা গুনাহকারী নয় তার (গুনাহ
 ক্ষমা হওয়ার জন্য) শাফায়াতের কি প্রয়োজন? (তার গুনাহ
 তো নামায ও অন্যান্য আমলের মাধ্যমে এমনিতেই মাফ হয়ে
 যাবে)। -জামে তিরমিযি: ২৪৩৬

আমাদের সকল আমলই রাসূলের নিকট পেশ করা হয়।

রাসূল তা জানতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাকে আমাদের বিপক্ষে সাক্ষী হিসেবে দাড়া করাবেন। তাই রাসূল বাধ্য হয়ে আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবেন। কিন্তু আমাদের মন্দ আমলের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে রাসূল কতটা ব্যথিত হবেন তা নিচের হাদিস থেকে উপলব্ধি করা যায়।

عن عمرو بن مرة، قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: «اقرأ علي» قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «فإني أحب أن أسمع من غيري» فقرأت عليه سورة النساء، حتى بلغت: [فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا] {النساء: 41} قال: «أمسك» فإذا عيناه تذرفان. صحيح

(4583) البخاري

(800) صحيح مسلم

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, আমাকে কুরআন পড়ে শোনাও। আমি বললাম, আমি আপনাকে কুরআন শোনাবো? অথচ তা আপনার উপরই অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বললেন, অন্যের মুখে শ্রবণ করাকে আমি পছন্দ করি। এরপর আমি তাঁকে ‘সূরা নিসা’ পড়ে শুনালাম। যখন আমি এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলাম, (অর্থ) ‘সুতরাং (তারা ভেবে দেখুক) সেই দিন তাদের অবস্থা কি হবে যখন আমি

প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন স্বাক্ষী উপস্থিত করবো এবং (হে নবী) আমি তোমাকে ঐসব লোক (অর্থাৎ এ উম্মতের) বিপক্ষে স্বাক্ষীরূপে উপস্থিত করবো।’ (সূরা নিসা: ৪১) তখন তিনি বললেন, থামো, থামো, তখন তাঁর দুচোখ থেকে টপ টপ করে অশ্রু বারছিল। -সহিহ বুখারী: ৪৫৮৩; সহিহ মুসলিম: ৮০০

হাফেয ইবনে হাজার রহ. হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন,

والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته، لأنه علم أنه لا بد أن يشهد
عليهم بعملهم وعملهم قد لا يكون مستقيماً فقد يفضي إلى
تعذيبهم، والله أعلم (فتح الباري لابن حجر 9 / 99)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত শুনে উম্মহর জন্য দয়াপরবশ হয়ে কেঁদেছেন। কেননা তিনি উম্মহর আমলের সাক্ষ্য দিবেন। আর তাদের আমল অনেক সময় ঠিকঠাক হবে না। তাই তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। -

ফাতহুল বারী: ৯/৯৯

রাসূল শুধু আমাদের আখেরাতের শাস্তির জন্যই পেরেশান ছিলেন তাই নয়, বরং দুনিয়াতেও যেন আমাদের উপর কোন শাস্তি না আসে সে জন্যও তিনি ব্যাকুল ছিলেন।

عن ابن عباس، قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شئت، قال:
شيتني هود، والواقعة، والمرسلات، وعم يتساءلون، وإذا
الشمس كورت. رواه الترمذي (3297) وقال: هذا حديث حسن

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু একদিন বললেন: ইয়া
রাসুলুল্লাহ! আপনি বৃদ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি বললেন: আমাকে
হুদ, ওয়াকিয়া, মুরসালাত, আন্মা ইয়াতাসা আলুন, ইয়াশ
শামসু কুওবিরাত- এই সূরাগুলো বৃদ্ধ করে ফেলেছে। -
জামে' তিরমিযি: ৩২৯৭

ইমাম তুরপুশতি রহ. বলেন,

يريد أن اهتمامي بما فيها من أهوال يوم القيامة والمثلثات
النوازل بالأمم الماضية أخذ مني مأخذه حتى شئت قبل أن
الشيب خوفًا على أمتي. الميسر في شرح مصابيح السنة
(3/ 1123) للتوربشتي

অর্থাৎ এ সূরা সমূহে যে কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা এবং
পূর্ববর্তী উম্মহর শাস্তির বিবরণ এসেছে, তা আমাকে
ভীতসন্ত্রস্ত করে দিয়েছে এবং আমি আমার উম্মাহর শাস্তির
ভয়ে অকাল বার্ধক্যে পৌঁছে গেছি। -আলমুয়াসসার: ৩/১১২৩
অপর হাদিসে এসেছে,

عن عائشة، قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه، قالت: يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية، فقال: يا عائشة ما يؤمني أن يكون فيه عذاب؟ عذب هذا عارض ممطرنا. قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب، فقالوا (4829) صحيح البخاري

আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই মেঘ অথবা ঝঞ্ঝা বায়ু দেখতেন, তখনই তাঁর চেহায়ায় (ভয়ের চিহ্ন) ফুটে উঠত। আয়েশা রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূল্লাহ! মানুষ যখন মেঘ দেখে, তখন বৃষ্টির আশায় আনন্দিত হয়, কিন্তু আপনি যখন মেঘ দেখেন, তখন আমি আপনার চেহায়ায় আতংকের ছাপ দেখতে পাই। তিনি বললেন, হে আয়েশা! এতে যে আযাব নেই, এ ব্যাপারে আমি কিভাবে নিশ্চিত হবো? বাতাসের দ্বায়াই তো এক কওমকে আযাব দেয়া হয়েছে। আরেক কওম তো আযাব দেখে বলেছিল, এ মেঘ আমাদের বৃষ্টি দান করবে। -সহিহ বুখারী: ৪৮২৯

ইমাম ইবনে রযব হাম্বলী রহ. বলেন,

إنما كان يظهر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الخوف من اشتداد الريح: لأنه كان يخشى أن تكون عذابا أرسل إلى أمته وكان شدة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته شفقة

عليهم، كما وصفة الله سبحانه وتعالى بذلك في قوله: [عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ]. {التوبة: 1289/237} فتح الباري

প্রবল বায়ু প্রবাহিত হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা অত্যন্তের ছাপ দেখা যেতো, কেননা তিনি আশংকা করতেন এটা হয়তো তার উম্মহর জন্য কোন শাস্তি হতে পারে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মহর জন্য এতটা ব্যাকুলতা ও ভয় ছিল উম্মহর প্রতি তার অতিশয় দয়ামায়ার কারণে। যেমনটা আল্লাহ তায়ালা তার ব্যাপারে বলেছেন, (অর্থ) ‘তোমাদের যে কোন কষ্ট তার জন্য অতি পীড়াদায়ক। সে সতত তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি অত্যন্ত সদয়, পরম দয়ালু।’ (সূরা তাওবা: ১২৮) -ফাতহুল বারী: ৯/২৩৭

২৪.শান্তি আলোচনার ব্যাপারে তালেবানের মুখপাত্র যবিহুল্লাহ মুজাহিদের বিবৃতি। (অনুবাদ)

আমেরিকার সাথে তালেবানের শান্তি আলোচনার ব্যাপারে কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে, কেউ কেউ মনে করছেন, তালেবান আমেরিকার সাথে দুটি চুক্তি সম্পাদন করেছে, যার একটি হলো, তালেবানরা আফগান ভূমি ব্যবহার করে

কাউকে আমেরিকা ও তার মিত্রদের উপর আঘাত হানার সুযোগ দিবে না। এরপর তারা এই চুক্তির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা শুরু করেছেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো তালেবানদের সাথে আমেরিকার এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, কিন্তু এখনো কোন চুক্তি সম্পাদিত হয়নি। ইমারাতে ইসলামিয়ার অফিসিয়াল উর্দু সাইট <http://alemarahurdu.com/> এ গত পরশু প্রকাশিত তালেবান মুখপাত্র যবিহুল্লাহ *মুজাহিদের বিবৃতি থেকে বিষয়টি সুস্পষ্ট। তাই তার বিবৃতিটি মূল উর্দু সহ অনুবাদ করে দিচ্ছি,

সদ্য সমাপ্ত শান্তি আলোচনার ব্যাপারে তালেবান মুখপাত্র যবিহুল্লাহ মুজাহিদের বিবৃতি

২৫ শে ফেব্রুয়ারী দোহায় আমেরিকার সাথে ইমারাতে ইসলামিয়ার প্রতিনিধিদের আলোচনা শুরু হয় এবং আজ ১২ মার্চ ১৭ দিন ব্যাপী এই আলোচনা শেষ হয়।

আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল জানুয়ারীতে নির্ধারিত হওয়া দুটি বিষয়,

- ১-আফগানিস্থান থেকে সকল বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহার।
- ২-অন্যান্য রাষ্ট্রের বিপক্ষে আফগান ভূমি ব্যবহারের সুযোগ না দেওয়া।

اُترھا ۽ آفغانسٹان تھكے بیدشئی سئیریا كی تھابے ۛ كاتٹوكو समयیر مڈھے بےر هبے، بےر هویرا پدكاتی كی هبے؟ اےب ۛ بویسیته آفغانسٹانیر بیاپاره آمیركیا ۛ تادیر میتررا كی تھابے نیشكسٹ تھاكبے؟

اےئ دوهی بویسے بلساریت آلوچنا ۛ تكبیترك هئ، اےئ সভای سے آلوچنا هئسے، اےب سكل پلساب اٹھاپن كرا هئسے تار بیاپاره اٹھ پكف آرو كسٹا تھابنا كرابے، اےب پربتئی آلوچنا সভار دینتاریخ اٹھ پكفیر سمسیتته نیرھاریت هبے۔ سئ সভار جنئ اখন تھكےئ پلستی ۛرر هبے۔

اٹلسے، اےئ সভای یكبیرت كی تھابا كابل سركاریر سائے آلوچنار كوان سیدكسٹ هئنی، تهمنی تھابے انئ كوان بویسكے آلوچنای آنا هئنی۔ سوترا ۛ اسب بویسے بیلین گنماڈھمیر بیوتی بیلنیھن۔

ببلسٹھاب مؤجاسید
مؤخماتر، ایماراته ائسلامییاھ
ۛ ركب ۛ88ۛ، ۛۛ ائ مارچ ۛۛۛۛ

مذاکرات كا حالیہ مرحلہ اختتام پذیر ہونے كے حوالے سے

ترجمان کا بیان

امریکی فریق کیساتھ امارت اسلامیہ کے نمائندوں کے مذاکرات 25/ فروری سے دوحا میں شروع اور آج سترہ دن یعنی 12/ مارچ کو اختتام پذیر ہوئے۔

مذاکرات کے سلسلے میں جنوری کے مہینے میں طے ہونیوالے دو متفقہ موضوعات پر مفصل اور ہمہ پہلو گفتگو ہوئی، وہ دو موضوعات افغانستان سے تمام بیرونی افواج کا انخلا اور دیگر ممالک کے خلاف افغان سرزمین کا عدم استعمال تھا۔ یہ کہ افغانستان سے تمام بیرونی افواج کس طرح اور کتنے عرصے میں نکلے گی اور انخلا کی ترتیب کیسی ہوگی؟ نیز مستقبل میں افغانستان سے امریکا اور اس کے اتحادی کس طرح مطمئن رہیں گے؟

ان دونوں امور میں کافی پیشرفت ہوئی ہے، اب تک ہونیوالی پیشرفت پر فریقین مزید غور کریگی، اسے اپنے قائدین سے شریک کریگی اور آئندہ اجلاس کے تعین کا اعلان فریقین کے مذاکراتی ٹیم کی اتفاق رائے سے کیا جائیگا، اس اجلاس کے لیے آمادگی کی جائیگی۔

واضح رہے کہ اس اجلاس میں جنگ بندی اور کابل انتظامیہ کیساتھ مذاکرات کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہوا ہے اور نہ ہی دیگر موضوعات کو ایجنڈا میں شامل کیا گیا ہے، اس حوالے سے چند ذرائع ابلاغ کی رپورٹیں بے بنیاد ہیں۔

ذبیح اللہ مجاہد ترجمان امارت اسلامیہ

رجب المرجب 1440 ھ بمطابق 12/ مارچ 2019ء /05

২৫. শাহাদাতের ফযীলতের ব্যাপারে একটি সংশয়ের উত্তর
(একটি হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা)

(একভাই নিম্নোক্ত হাদিসটির ব্যাখ্যা এবং হাদিসের উপর যে
ইশকাল হয় তার উত্তর জানতে চেয়েছেন। বিষয়টি
গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে আমি এর উত্তর নতুন খেঁড়ে
দিচ্ছি।)

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدِ السُّلَمِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَخَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَقُتِلَ أَحَدُهُمَا مَاتَ الْأَخْرَ بَعْدَهُ، فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ،
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا قُلْتُمْ؟» قَالُوا: دَعَوْنَا لَهُ
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اللَّهُمَّ أَلْحِفْهُ بِصَاحِبِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ؟ وَأَيْنَ عَمَلُهُ بَعْدَ
عَمَلِهِ؟ فَلَمَّا بَيَّنَّهُمَا كَمَا بَيَّنَّ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ». رواه النسائي
(1985) وأبو داود (2523) وأحمد (17921) وابن أبي شيبة
(35566) وقال الإمام ابن الملقن في البدر المنير (9 / 232) :
وقال الشيخ عوامة في تعليقه على مصنف . هذا الحديث صحيح
هو حديث صحيح. وقال الشيخ : (19/127) ابن أبي شيبة
شعيب: إسناده صحيح

অর্থ: উবাইদ বিন খালিদ আসসুলামী রাযি. থেকে বর্ণিত,
তিনি বলেন, ‘রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই

ব্যক্তির মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দিলেন। তাদের একজন (যুদ্ধে) নিহত হন এবং অন্যজন তার পরে কোন এক জুম'আর দিন কিংবা তার কাছাকাছি কোন দিনে মারা যান। আমরা তার জানাযা আদায় করলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা (দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য) কি দু'আ করেছো? আমরা বললাম, আমরা তার জন্য দু'আ করেছি এবং বলেছি, “হে আল্লাহ! তাঁকে ক্ষমা করুন এবং তাঁকে তারঙ্গীর সাথে মিলিত করুন”। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে প্রথম ব্যক্তির সালাতের পর দ্বিতীয় ব্যক্তির সালাত, প্রথম ব্যক্তির সওমের পর দ্বিতীয় ব্যক্তির সওম ও অন্যান্য আমল কোথায় যাবে? এ দুই ব্যক্তির (মর্যাদার) মধ্যে আসমান-যমীনের ব্যবধান।’ -সুনানে নাসায়ী: ১৯৮৫; সুনানে আবু দাউদ: ২৫২৩; মুসনাদে আহমদ: ১৭৯২১; মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা: ৩৫৫৬৬

হাদিসের মান:- ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন, শায়েখ আওয়ামা, শায়েখ শুয়াইব রহ. হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। (দেখুন, আলবদরুল মুনির: ৯/২৩২; মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, তাহকীক: শায়েখ আওয়ামা: ১৯/১২৭; সুনানে আবু দাউদ, তাহকীক: শায়েখ শুয়াইব: ৪/১৭৯)

ইশকালঃ- এখান থেকে বুঝে আসে শহীদি মৃত্যুর চেয়ে স্বাভাবিক মৃত্যুর ফজিলত বেশী। অনেকে এটার মাধ্যমে দলিলও পেশ করে।

উত্তর: হাদিস থেকে যে ইশকাল সৃষ্টি হয় এটা বুঝার পূর্বে আমরা শরিয়তের একটি মূলনীতি বুঝে নিলে ভালো হবে। মূলনীতিটি হলো:-

কুরআন-সুন্নাহর কোন বক্তব্য বাহ্যিকভাবে অপর বক্তব্যের বিরোধী হয়ে গেলে যেটা ‘মুহকাম’ বা দ্ব্যর্থহীন সেটা অনুযায়ী আমল করা হবে, আর যে বক্তব্য ‘মুতাশাবিহ’ বা দ্ব্যর্থবোধক সেটাকে মুহকামের সাথে মিলিয়ে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হবে যেন দুই বক্তব্যের মাঝে কোন বিরোধ না থাকে, পরিভাষায় একে *رَدُّ الْمُتَشَابِهِ إِلَى الْمُحْكَمِ* (মুতাশাবিহকে মুহকামের দিকে ফিরানো, মুহকাম অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা) বলা হয়। -(এ মূলনীতির জন্য দেখুন, সুরা আলে ইমরান, আয়াত, ৭; আহকামুল কুরআন, ইমাম জাসসাস, 2/282 দারু ইহইয়াউত তুরাস 1405 হি.; তাফসীরে ইবনে কাসীর, ২/৩৬৫ দারু তাইয়েবাহ, 1419 হি.; বাদায়েউস সানায়ে’ ১/২১ দারুল কুতুব, ১৪০৬ হি.; বাহরুল রায়েক, ১/২৫৯ দারুল কিতাবিল ইসলামী; ই’লামুল মুওয়াক্কিযীন, ৪/৫৮ দারু ইবনুল জাওয়ী, ১৪২৩ হি.; ফাতহুল বারী, ইবনে রজব,

7/240 মাকতাবাতুল গুরাবা আলআছারিয়াহ, ১৪১৭ হি.)

এবার উপরোক্ত মূলনীতির আলোকে আমরা হাদিসটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো। তো আমরা জানি ইসলামে শাহাদাতের মর্যাদা অনেক অনেক বেশি। কুরআন-সুন্নাহয় শাহাদাতের ফযীলতের ব্যাপারে অসংখ্য আয়াত-হাদিস এসেছে। এমনকি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হওয়া স্বত্বেও শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছেন। সুতরাং শহিদি মৃত্যুর ফযীলত যে স্বাভাবিক মৃত্যুর চেয়ে বেশি- এটা শরীয়তের একটি মুহকাম বিধান যাতে কোন ধরণের তাওয়ীল বা ব্যাখ্যার সুযোগ নেই। পক্ষান্তরে আমাদের আলোচ্য হাদিসটি মুতাশাবিহ বা দ্ব্যর্থবোধক। একে তো এ ব্যাপারে হাদিস শুধু একটিই, অধিকন্তু হাদিসটি স্বাভাবিক মৃত্যু শহিদি মৃত্যুর চেয়ে উত্তম- এ ব্যাপারে অকাটা প্রমাণ নয়, এতে ব্যাখ্যার সুযোগ রয়েছে। তাই উপরোক্ত মূলনীতির আলোকে হাদিসটির ব্যাখ্যা এমনভাবে করতে হবে যেন তা শরীয়তের মুহকাম বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যায়। তো হাদিসটির ব্যাখ্যা কি? আল্লামা খলিল আহমদ সাহারানপুরী রহ. হাদিসটির ব্যাখ্যায় বলেন,

وقد يستشكل فضيلة درجة الآخر بالصلاة والصوم والأعمال
غير الصلاة والصوم على القتل في سبيل الله. قلت: لا إشكال
فيه، فإن بعضهم يبلغ درجة بالصلاة والصوم لا يبلغها الشهداء،

ألا ترى أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - بلغ درجة من الفضل لم يبلغها الشهداء وغيرهم بكمال إخلاصه وصدقه مع الله - تعالى -، فلعل هذا الرجل الآخر بلغ درجة بإخلاصه وصدقه بذل (في أعماله لم يبلغها الأول مع شهادته في سبيل الله)
 (المجهود في حل سنن أبي داود 9 / 86

‘হাদিসের উপর আপত্তি উত্থাপিত হয়, কারণ হাদিস থেকে বুঝে আসে, দ্বিতীয় ব্যক্তি নামায রোযা দ্বারা শাহাদাতের শাহাদাতের চেয়েও বেশি ফযিলত অর্জন করেছেন। আমি বলবো, হাদিসে কোন আপত্তি নেই। কেননা, কেউ কেউ নামায-রোযার দ্বারা সেই স্তরে পৌঁছে যায় যে স্তরে শহিদরাও পৌঁছতে পারেন না। যেমন আবু বকর রাযি. নিজের ইখলাস ও আল্লাহর সাথে সততা দ্বারা (শহিদ না হয়েও) সে স্তরে পৌঁছেছেন যে স্তরে শহিদরাও পৌঁছতে পারেনি। তো হতে পারে এই দ্বিতীয় ব্যক্তি তার নামায-রোযায় ইখলাস ও সিদকের দ্বারা সেই স্তরে পৌঁছেছেন যে স্তরে প্রথম ব্যক্তি শহিদ হয়েও পৌঁছতে পারেননি।’ - বায়লুল মাজহুদ: ৯/৮৬

তো যারা এ হাদিস দিয়ে স্বাভাবিক মৃত্যুকে শহিদ মৃত্যুর চেয়ে উত্তম বলে দলিল পেশ করেন তারা কি বলতে পারবেন, আমাদের নামায-রোযায় সিদক ও ইখলাস এত উচ্চ স্তরের যার দ্বারা আমরা সেই সাহাবীর মতো

শাহাদাতের চেয়েও বেশি মর্যাদা লাভ করতে পারবো?! অথচ আমাদের নামাযের কি দুরবস্থা তা তো আমরা সকলেই জানি। লাখো মুসল্লির মাঝে কতজন খুশু-খুযুর সাথে নামায পড়েন?

তাছাড়া এই যে দ্বিতীয় সাহাবী যিনি পরে মারা গেলেন তিনি কি আমাদের মতই জিহাদ ও শাহাদাতের প্রতি অনাগ্রহী ছিলেন? না কি তিনি শাহাদাতের সন্ধানে জিহাদের ময়দানে ছুটে বেড়িয়েছেন? তাই হাদিসের সুসংবাদ অনুযায়ী তিনি তো শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করতে পারেন। কিন্তু আমরা জিহাদের জন্য কোন ধরণের প্রস্তুতি না নিয়ে ঘরে বসে থেকে বরং জিহাদ ও শাহাদাতের প্রতি মানুষকে অনুৎসাহিত করে কিভাবে স্বাভাবিক মৃত্যু দ্বারা তার মতো শহীদের চেয়েও উত্তম মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা করতে পারি? আলোচ্য হাদিসের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন,

وذلك لأنه أيضا كان مرابطا في سبيل الله، فله المشاركة في الشهادة حكما وطريقة، وله الزيادة في الطاعة والعبادة شريعة وحقيقة، وإلا فمن المعلوم أن لا عمل أزيد ثوابا على الشهادة جهادا في سبيل الله، وإظهارا لدينه، لا سيما في مبادئ الدعوة مع قلة أعوانه من أهل الملة. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة

المصابيح (8/3307)

‘দ্বিতীয় ব্যক্তি মর্যাদায় শহীদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণ

হলো) সেও আল্লাহর পথে মুরাবিত ছিল। তাই সেও হুকমী শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছে। পাশাপাশি সে ইবাদত ও আনুগত্যও বেশি করেছে। নতুবা এটা তো সর্বজনবিদিত যে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য জিহাদে শহিদ হওয়ার তুলনায় কোনো আমলের সওয়াব বেশি হতে পারে না। বিশেষকরে দাওয়াতের সূচনালগ্নে যখন দ্বীনের সাহায্যকারী কম থাকে।’ -মেরকাতুল মাফাতিহ: ৮/৩৩০৭

সারকথা হলো, হাদিসটি যেহেতু বাহ্যিকভাবে ইসলামের সর্বস্বীকৃত মুহকাম বিষয়ের বিপরীত, তাই ইলমের মূলনীতি অনুযায়ী হাদিসটির ব্যাখ্যা করতে হবে। ব্যাখ্যা একাধিক হতেই পারে, যার নিকট যে ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য মনে হয় তিনি তা গ্রহণ করবেন। কিন্তু কুরআন-সুন্নাহর অসংখ্য নুসুস দ্বারা প্রমাণিত শরিয়তের সর্বস্বীকৃত একটি বিষয়কে এ ধরনের একটি মাত্র দ্ব্যর্থবোধক হাদিস দিয়ে পাণ্টে ফেলার চেষ্টা করা অন্তরের বক্রতারই প্রমাণ বহন করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ

‘(হে রাসূল!) তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন, যার কিছু আয়াত মুহকাম, যার উপর

কিতাবের মূল ভিত্তি এবং অপর কিছু আয়াত মুতাশাবিহ।
 যাদের অন্তরে বক্রতা আছে, তারা সেই মুতাশাবিহ আয়াতের
 পেছনে পড়ে থাকে, উদ্দেশ্যে ফিতনা সৃষ্টি করা এবং সেসব
 আয়াতের তাবীল খোঁজা। -সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৭

হায়! এধরণের মুতাশাবিহ ও দ্ব্যর্থবোধক হাদিস পেশ করে
 উম্মাহকে জিহাদ বিমুখ করা কি কোন আলেমের শান হতে
 পারে? অথচ আলেমগণ তো সেই নবীর ওয়ারিশ যাকে
 আদেশ করা হয়েছে মুমিনদের জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার।
 পক্ষান্তরে জিহাদ থেকে বিমুখ করা, জিহাদে অনুৎসাহিত
 করা তো মুনাফিকদের অভ্যাস। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ
 الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا (18) أَشْحَةً عَلَيْكُمْ

‘আল্লাহ তাদেরকে ভালো করেই জানেন, তোমাদের মধ্যে
 যারা (জিহাদে) বাধা সৃষ্টি করে এবং নিজ ভাইদেরকে বলে,
 আমাদের কাছে চলে এসো। আর তারা নিজেরা তো যুদ্ধে
 আসেই না; আসলেও তা অতি সামান্য।(এবং তাও
 তোমাদের গনিমতের) প্রতি লালায়িত হয়ে।’ -সূরা আহযাব:

১৮-১৯

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সঠিকভাবে কুরআন-সুন্নাহ বুঝার
ও মানার তাওফিক দান করুন।

২৬. শিরক সংমিশ্রিত ঘটনা বিশ্বাস করার ব্যাপারে শায়েখ
রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. এর ফতোয়া

শিরক সংমিশ্রিত ঘটনা বিশ্বাস করা

প্রশ্ন: নিম্নোল্লিখিত কারামতগুলোর হুকুম কি?

ক. হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহ. এর মুরিদ ইত্তেকাল
করলে তার ছেলে কাঁদতে কাঁদতে হযরতের কাছে আসেন,
তাকে দেখে হযরতের দয়া হয়, তিনি চতুর্থ আসমানে গিয়ে
মালাকুল মউতের কাছ থেকে মুরিদের রুহ ফেরত চান,
মালাকুল মউত বলেন, আল্লাহ তায়ালা আদেশে আপনার
মুরিদের রুহ কবয করেছি। হযরত বলেন, আমার আদেশে
ফেরত দাও। মালাকুল মউত রুহ ফেরত না দিলে হযরত
আব্দুল কাদের জিলানী সেই দিন কবয করা রুহগুলো যে
খলিতে ছিল সেটি জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেন। এতে সেই দিন
মৃত্যুবরণকারী লোকেরা পূণর্জীবন লাভ করে।

মালাকুল মউত আল্লাহ তায়ালা কাছে গিয়ে বলেন, এক
পাগল রুহের খলি কেড়ে নিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা
বললেন, সে আবার এদিকে আসছে না তো? ফেরেশতা

বললেন, না, এদিকে আসছে না। আল্লাহ তায়াল্লা বললেন, সে ফেরত যাওয়ায় ভালোই হয়েছে, যদি সে এদিকে আসতো আর আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত যত মানুষ মারা গেছে তাদের সবাইকে জীবিত করতে বলতো, তাহলে আমি সবাইকে যিন্দা করতে বাধ্য হতাম।

খ. এক মহিলা হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহ. এর নিকট এসে বলেন, হযরত আমাকে সন্তান দান করুন। হযরত বললেন, তোমার তাকদীরে তো লওহে মাহফুযে সন্তান লেখা নেই। মহিলা বললো, যদি লওহে মাহফুযে লেখাই থাকতো তাহলে আপনার কাছে আসার কি প্রয়োজন ছিল? হযরত আল্লাহ তায়াল্লার কাছে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ আপনি তাকে সন্তান দান করুন। আল্লাহর পক্ষ হতে জবাব আসলো, তার ভাগ্যে তো লওহে মাহফুযে সন্তান লেখা নেই। হযরত বললেন, একটি না থাকলে দুটি দেন, জবাব আসলো, একটিই যখন নেই তো দুটি কিভাবে দেব? হযরত বললেন, দুটি না থাকলে তিনটি দেন, জবাব আসলো, যখন দুটিই নেই তো তিনটি কিভাবে দেব? তার তাকদীরে তো কোন সন্তানই নেই। মহিলা নিরাশ হয়ে চলে যেতে উদ্যত হলে হযরত বড়পীর রহ. রাগান্বিত হয়ে তার দরজার মাটি তা'বীজ বানিয়ে মহিলাকে দিলেন এবং বললেন, তোমার সাতটি সন্তান হবে। মহিলা খুশি খুশি চলে গেল, এবং

বাস্তবেই তার সাতটি সন্তান হয়েছিল।

গ. হযরত আব্দুল কাদের জীলানীর মৃত্যুর পর এক ব্যক্তি তাকে সপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো, মুনকার-নাকীর থেকে আপনি কিভাবে মুক্তি পেলেন? জবাবে হযরত বললেন, বরং এটা জিজ্ঞেস করো যে, মুনকার-নাকীর আমার প্রশ্নের জবাব থেকে কিভাবে মুক্তি পেল? তারা আমার কবরে আসলে আমি তাদের উভয় হাত আকড়ে ধরে বললাম, যখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, আমি যমিনে খলিফা প্রেরণ করবো তো তোমরা কেন বলেছিলে যে, আপনি তো এমনি ব্যক্তিদের সৃষ্টি করবেন যারা যমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করবে, তোমরা কি ভেবেছিলে যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কাছে পরামর্শ চাচ্ছেন!

উত্তর:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ - (হুকুম দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর -
সূরা ইউসুফ, আয়াত ৪০)।

উপরোল্লিখিত কারামাতগুলো মূর্তিপূজারীদের আকীদা-
বিশ্বাস। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,
'তোমাদের কেউ মন্দ কাজ হতে দেখলে বাহুবলে তা
প্রতিহত করবে। তা না পারলে জিহ্বার দ্বারা প্রতিরোধ

করবে। আর এটাও না পারলে অন্তরের দ্বারা ঘৃণা করবে। এটাও না করলে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানও বাকী থাকে না’। যারা এই শিরকমিশ্রিত ঘটনাগুলোকে হক মনে করে, এবং এই কুফরি-শিরকী আকীদা পোষণ করে তারা সুস্পষ্টরূপে কুরআন-হাদিসের বিরোধীতায় লিপ্ত, এবং তারা মূর্তিপূজারীদের মতোই আব্দুল কাদের জীলানীর পূজারী। তারা বান্দাকে আল্লাহ মনে করে, বরং পরাক্রমশালী অদ্বিতীয় আল্লাহকে বান্দার সামনে বাধ্য-পরাস্ত জ্ঞান করে। এমন বিশ্বাস লালনকারী কাফের ও *মুশরিক। যদি বুঝা হওয়ার শুরু থেকেই এই বিশ্বাস রাখে তাহলে প্রথম থেকেই কাফের। যতক্ষণ সে এই কুফরী আকীদা থেকে তাওবা না করবে এবং কালেমা পড়ে ঈমান দোহরিয়ে না নিবে ততক্ষণ পর*্যন্ত সে মুসলমান হবে না। আল্লাহ তায়লা বলেন,

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

‘যে আল্লাহর সাথে শিরিক করে আল্লাহ তায়লা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন, এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম, যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী থাকবে না’। -সূরা মায়েদা, আয়াত ৭২

যদি কোন মুসলমানের গুনাহে পৃথিবী পূর্ণ হয়ে যায়, কিন্তু সে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করে তাহলেও

মেহেরবান আল্লাহ নিজ দয়ায় তাকে ক্ষমা করে দেওয়ার
 ওয়াদা করেছেন। কিন্তু মুশরিককে আল্লাহ তায়ালা কখনো
 ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ
 يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

‘আল্লাহ তায়ালা তার সাথে শিরিক করাকে ক্ষমা করবেন না,
 শিরিক ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন।
 যে আল্লাহর সাথে শরিক করে সে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে
 লিপ্ত’।

-সূরা নিসা, আয়াত: ১১৬

আর যারা প্রথমে তাওহীদের বিশ্বাসী ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে
 এই শিরকী বিশ্বাস গ্রহণ করেছে, তাদের সব নেক আমল
 বরবাদ হয়ে যাবে, এই বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ করলে তারা
 জাহান্নামী হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ
 أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

‘তোমাদের মধ্যে হতে যারা নিজেদের ধর্মত্যাগ করে
 (কাফের হয়ে যায়), অতপর কাফের অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে
 তাদের দুনিয়া-আখেরাতে তাদের সকল আমল বরবাদ হয়ে

যায়, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। যেখানে তারা থাকবে
চিরকাল’। -সূরা বাকারা, আয়াত: ২১৮

উত্তর প্রদান:
মুহাম্মদ হুসাইন দেহলভী

এই ফতোয়াটি শায়েখ রশীদ আহমদ গাজুহী সহ
উপমহাদেশের বড় বড় আলেমদের সম্মুখে পেশ করা হয়,
তারা এই ফতোয়াটিকে সহিহ বলে সমর্থন করেন, এতে
স্বাক্ষর করেন। শুধু মৌলভী ইরশাদ হুসাইন রামপুরী বলেন,
‘এই কারামতগুলো প্রত্যাখ্যান করা যায় না। কেননা এতে
শরিয়ত ও ইসলামের আকীদা পরিপন্থী কোন কিছু নেই।
আর শেষ কারামতটা ইকতেবাসুল আনওয়ার নামক গ্রন্থে
রয়েছে, যা একটি গ্রহণযোগ্য কিতাব। আর প্রথম দুটি
কারামত যদিও আমি কোন কিতাবে পাইনি, কিন্তু হযরত
গাউসুস সাকালাইন (উভয় জাহানের সাহায্যকারী) এর
ব্যাপারে লিখিত কিতাব অনেক, হতে পারে কোন কিতাবে
এটি নকল করা হয়েছে’

তার কথা খন্ডন করে শায়েখ রশিদ আহমদ গাজুহী রহ.
বলেন, ‘মৌলভী ইরশাদ হুসাইন সাহেবের কথা বড়ই
আশ্চর্যজনক যে, তিনি এই ঘটনাগুলোর বাহ্যিকরূপকে

শরিয়তের খেলাফ মনে করেন না। বিশেষ করে প্রথম ঘটনাতে হযরত আব্দুল কাদের জিলানী কর্তৃক আল্লাহ তায়ালার আদেশ রদ করে দেওয়া, তার নিকট আল্লাহ তায়ালার পরাস্ত হওয়া এবং তাকে ভয় পাওয়া তো সুস্পষ্ট। যদি এগুলো শরিয়ত বিরোধী না হয় তাহলে আর কোন জিনিষ শরিয়ত বিরোধী হবে? যদি তিনি কোন ব্যাখ্যা করে এই জবাব দিতেন তাহলে কোন সমস্যা ছিল না। কিন্তু কোন ব্যাখ্যা ব্যতীত সুস্পষ্টরূপে এই ঘটনাগুলোকে সহিহ বলা একেবারেই অবাস্তব। বরং এধরণের কথা মূর্খদের গোমরাহ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানীর কামালাত তো হবে আল্লাহ তায়ালার দ্বাসত্ব ও গোলামী এবং আল্লাহর দরবারে তার পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও অক্ষমতা প্রকাশ করার দ্বারা। এধরণের ঘটনা তো শায়েখ তাসলীম ও রেযার (আল্লাহর ফয়সালা মেনে নেওয়া ও তাতে সন্তুষ্ট হওয়া) যে উচ্চস্তরে ছিলেন তার বিরোধী, তাসলীম ও রেযার বিষয়ে শায়েখের কিতাব ফুতুহুল গাইবে তার বক্তব্য সুস্পষ্টরূপে রয়েছে। সুতরাং তার ব্যাপারে আল্লাহর তায়ালার আদেশের বিরোধীতা করা এবং আল্লাহ তায়ালার সাথে ঝগড়া করার কল্পনাই করা যায় না। এ ঘটনা কোন ধর্মদ্রোহী মুলহিদের বানানো, এগুলোর কোন বাস্তবতা নেই। এই ঘটনাগুলো বাহ্যিকভাবে কুফর ও শরিয়তবিরোধী, বিশেষকরে প্রথম ঘটনাটা। মুসলমানদের এধরণের বিশ্বাস থেকে বেঁচে থাকতে

হবে।(ফতোয়ায়ে রশিদিয়া, পৃ: ১৯০)

চিন্তা করুন, যদি উল্লিখিত ঘটনাগুলো ভিত্তিহীন ও শিরকী হয়, ধর্মদ্রোহী মুলহিদদের বানানো হয়, তাহলে ভেদে মা'রেফাতের ১৫ নং পৃষ্ঠায় লিখিত শামসে তাবরিযীর ঘটনা, যাতে শামসে তাবরিযী নিজের হুকুমে মৃতকে জিন্দা করছে, আল্লাহর আন্দায় নেই বলছে, আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে জোরপূর্বক রুহ ছিনিয়ে নিয়ে আসছে, এবিষয়গুলো কি শিরক হবে না? অথচ এখনও ফয়জুল করীম সাহেব সুস্পষ্টরূপে বলছেন যে, ভেদে মারেফাতে কোন ভুল থাকলে তারা সংশোধন করবেন, বরং প্রয়োজনে ভেদে মারেফত জালিয়ে পুরে ফেলবেন, কিন্তু তাদের নজরে ভেদে মারেফাতে কোন ভুল তারা দেখছেন না', নাউযুবিল্লাহ, (এই ভিডিওটির ৫৬-৬০ সেকেন্ড পর্যন্ত দেখুন,

<https://www.youtube.com/watch?v=rNul1Ja2o88>

) অথচ তারা আবার নিজেদের গাঙ্গুহী রহিমাল্লাহর সিললিলা বলেও দাবী করেন। আর এ ধরনের গাজাখুরী গল্পের বাস্তবতা বোঝার জন্য তো ফতোয়ারও প্রয়োজন হয় না, সামান্য পরিমাণ আকল থাকাই যথেষ্ট।

আর যে আলেমরা এ ধরনের কুফরী-শিরকী বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও চরমোনাইকে হক দল এবং চরমোনাইর পীরকে

হক্কানী পীর বলছেন, তাদের পক্ষাবলম্বন করছেন তারা কি শিরকের প্রসারে সাহায্য করছেন না? আলেমদের দ্বায়িত্বের ব্যাপারে তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف " :
الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين". رواه البزار (م)
في مسنده (3884) والإمام الطحاوي (م: 321) في شرح (292)
وقال الإمام ابن الوزير اليمني (م: (مشكل الآثار، (3884)
مؤسسات الرسالة) (840) في العواصم والقواصم : (1/308 ط
: (هو حديث مشهور صححه ابن عبد البر. وروي عن أحمد
أنه قال: هو حديث صحيح

এই ইলমের ধারকবাহক হবে ন্যায়পরায়ণ উত্তরসূরীগণ,
যারা এ থেকে সীমালঙ্ঘন কারীদের তাহরীফ বা অর্থবিকৃতি,
মূর্খদের অপব্যথা এবং মিথ্যাবাদীদের মিথ্যাকে অপসারণ
করবেন। - মুসনাদুল বাযযার: ৯৪২৩ শরুহ মুশকিলুর
আসার: ৩৮৮৪ ইমাম আহমদ হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন,
দেখুন, আলআওয়াসেম ওয়ালকাওয়াসেম, ইবনুল ওযীর
আলইয়ামানী, ১/৪০

কারো মনে হতে পারে যে আমরা চরমোনাইর সাথে সংশ্লিষ্ট
লাখো মানুষকে কাফের-মুশরিক বানিয়ে দিচ্ছি, না, বিষয়টি

আদৌও নয়। চরমোনাইর সাধারণ মুরিদ যারা এ ঘটনাগুলো জানেন না বা জানলেও বিশ্বাস করেন না আমরা তাদেরকে কখনোই কাফের মনে করি না। আর যারা এ ঘটনাগুলো বিশ্বাস করে, তাদেরকে আমরা কাফের বানাচ্ছি না, বরং তারা তো বাস্তবে কাফের-মুশরিক হয়েই আছে। আমরা শুধু তাদের কুফর-শিরককে মানুষের সামনে স্পষ্ট করে দিচ্ছি, যেন মানুষ এ ধরনের শিরকী বিশ্বাস থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

উল্লিখিত ফতোয়াটি তা'লীফাতে রশিদিয়া ও ফতোয়ায়ে রশিদিয়া উভয় কিতাবেই রয়েছে, আমি ফতোয়ায়ে রশিদিয়া (১৮৪-১৯১ পৃষ্ঠা, প্রকাশনা: দারুল ইশাআত, করাচী) থেকে ফতোয়াটির ওয়ার্ড কপি তুলে দিচ্ছি, পিডিএফের স্ক্রীণশট দেখতে চাইলে নিচের লিংক থেকে ডাউনলোড না করেই দেখতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

<https://telegra.ph/%E0%A6%B6%E0%A6B...E0%A7%9F-05-31>

আর ভেদে মারেফাতের ঘটনাটা তো সবার জানাই আছে, তবুও স্ক্রীণশট দেখতে চাইলে এই লিংক থেকে দেখতে পারেন,

مشرکانہ حکایات پر اعتقاد

ان کرامتوں مفصلہ ذیل میں کیا حکم ہے۔ :سوال
حضرت غوث اعظم قدس سرہ کے ایک مرید نے انتقال کیا اس کا بیٹا روتا ہوا آپ کے پاس آیا آپ نے اس کے حال پر رحم فرما کر آسمان چہارم پر جا کر ملک الموت سے روح مرید کو مانگا ملک الموت نے جواب دیا کہ خدا تعالیٰ کے حکم سے روح آپ کے مرید کی قبض کی ہے آپ نے فرمایا میرے حکم سے چھوڑ دے جب ملک الموت نہ دی تو آپ نے زبردستی زنبیل تمام روحوں کو جو اس دن قبض کی تھیں چھین لیں۔ تمام روحوں پرواز کر کے اپنے اپنے جسد میں داخل ہوئیں ملک الموت نے خدائے تعالیٰ کے پاس فریاد کی کہ ایک شخص مجنون نے زنبیل روحوں کی چھین لی۔ فرمایا وہ ادھر کو تو نہیں آتا عرض کیا نہیں آتا کہا اچھا ہوا جو واپس گیا ورنہ وہ اگر ادھر کو آتا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جتنے مرے ہیں سب کے زندہ کرنے کو کہتا تو مجھے سب زندہ کرنے پڑتے۔ رسیدہ بود بلائے ولے بخیر گزشت۔

ایک عورت حضرت عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا یا حضرت مجھے بیٹا دو آپ نے فرمایا تیری تقدیر میں لوح محفوظ میں نہیں ہے اس نے عرض کی اگر لوح محفوظ میں ہوتا تو تمہارے پاس کیوں آتی آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا خدا تو اس عورت کو بیٹا دے حکم ہوا اس کی قسمت میں لوح محفوظ میں بیٹا نہیں ہے کہا ایک نہیں تو دو دے۔ جواب آیا ایک نہیں تو دو کہاں سے دوں کہا تو تین دے۔ کہا جب ایک بھی نہیں تو تین کہاں

سے اس کی تقدیر میں بالکل نہیں۔ جب وہ عورت ناامید ہوئی۔ غوث اعظم نے غصہ میں آکر اپنے دروازہ کی خاک تعویذ بنا کر دے دی۔ اور کہا تیرے سات بیٹے ہوں گے وہ عورت خوش ہو کر چلی گئی اور اس کے سات بیٹے ہوئے۔

بعد وفات حضرت عبدالقادر جیلانی ایک بزرگ نے آپ کو خواب میں دیکھا۔ کہا منکر نکیر کے جواب سے آپ نے کیونکر رہائی پائی۔ جناب شیخ نے فرمایا یوں پوچھو کہ منکر نکیر نے میرے سوالوں کے جواب میں کیونکر رہائی پائی جس وقت میرے پاس قبر میں آئے میں نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لئے اور کہا یہ بتلاؤ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کریں گے تو تم نے یہ کیوں کہا کہ اے اللہ تو ایسے شخص کو پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد پیدا کرے گا شاید تم نے اللہ تعالیٰ کو مشورت طلب ٹھہرایا۔

ان الحكم الا الله یہ کرامات مندرجہ سوال بت :جواب پرستوں کے عقیدہ والوں کے ہیں۔ قد جاء فی الحدیث من رای منکم منکرا فلیغیره بیده ومن لم یستطع فبلسانه ومن لم یستطع فبقلبه ولیس وراء ذلك حبة خردل من الايمان۔ جو لوگ ان کرامات شرکیہ مذکورہ کو حق جانتے ہیں اور اس عقیدہ شرکیہ کفریہ پر ہیں سراسر مخالف قرآن اور حدیث کے ہیں اور مثل بت پرستوں کے عبدالقادر پرست ہیں بندہ کو خدا اعتقاد کرتے ہیں العیاذ باللہ بلکہ اس واحد و قہار و قیوم و جبار کو بندہ کے آگے مجبور جانتے ہیں ایسے عقیدے والے قطعی کافر اور مشرک پیناگر وہ کوئی ابتدائے تمیز سے اس عقیدہ پر ہے تو پرانا کافر ہے جب تک اس کفریہ عقیدہ سے توبہ نہ کرے اور تجدید اسلام کلمہ شہادت

سے نہ کرے مسلمان نہیں۔ قال الله تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماونه النار وما للظالمين من انصار۔ اگر کسی مسلمان کے گناہوں سے ساری زمین لبریز ہو اور شرک نہ ہو تو حق جل جلالہ اس کے بخشنے کا وعدہ فرماتا ہے اپنی رحمت سے مگر مشرک کافر ہرگز نہ بخشا جائیگا۔ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضلّ ضلّالاً بعيداً۔ اور جو لوگ اول عقیدہ توحید کا رکھتے تھے اور بعد میں اس شرکیہ عقیدہ پر ہو گئے ہیں تو ان کے پہلے نیک عمل سب برباد ہو گئے اگر اس کفر پر مر جائیں تو دو زخی ہیں بموجب فرمان الہی کے ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وهو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والاخرۃ واولئک اصحاب النار ہم فیہا خلدون۔ (۱)۔ نعوذ باللہ من شر الکاذبین المبتدعین الباطلین الطاغین الفاسقین واللہ اعلم بالصواب فاعتبر وایا اولی اللباب حرہ الفقیر محمد حسین الدہلوی عفا اللہ عنہ۔

الجواب حق محمد اشرف علی عفی عنہ سلہٹی

-

الجواب صحیح۔ عبدالمجید عرف محمد قابل عفی عنہ مدرس
-مدرسہ اسلامیہ

یہ باتیں عوام کالا انعام بل ہم اضل کی ہیں ان سے احتراز
- مسلمانوں پر واجب ہے فقط قادر علی عفی عنہ

صح الجواب بعون اللہ الملک الوہاب شہر اسلام آباد عرف
چاٹگام۔

الجواب صحیح - سید عبدالسلام غفرلہ۔

الجواب صحیح۔ سید محمد ابوالحسن۔

الجواب صحیح۔ سید معتصم باللہ حنفی
 محمد عبدالحکیم عفی عنہ کرامات مذکورہ بے اصل ہیں ان
 کے اعتقاد سے احتراز چاہیے محمد حسن عفی عنہ
 یہ حکایات لا اصل ہیں اعتقاد کے لئے یقینی باتیں درکار ہیں
 معتقدان باتوں کا یا نادان ہے یا کجرو مسلمانوں کو بہر حال
 ایسی باتوں سے اعتقاد ہٹانا چاہیے اور سچے اور پکے
 مسلمانوں کے عقائد دل میں جمانے چاہیں فقط محمد ناظر
 - حسن عفی عنہ مدرس مدرسہ اسلامی میرٹھ شہر
 کرامت مذکورہ کا معتقد مخالف قرآن و حدیث کا ہے ایسے
 اعتقاد سے پرہیز کرنا لازم ہے فقط مسعود نقشبندی۔

الجواب صحیح محمد عبیداللہ

الجواب صحیح عبدالحق

ایسے عقائد مشرکین و مبتدعین کے ہیں جواب مجیب کا اور
 مواہیر و دستخط صحیح ہیں حسبن اللہ بس حفیظ اللہ
 الجواب صحیح والرئے نجیح الغرض جناب شیخ عبدالقادر
 جیلانی قدس سرہ ولی کامل فی زعما ہیں صاحب کرامات
 ہیں مگر عوام کالانعام جہلا لوگوں نے ہزارہا حکایات اکاذیب
 گھڑ رکھی ہیں منجملہ ان کے جو سوال میں درج ہیں اور
 انہیں کے لگ بھگ یہ کرامت بھی افترا کی ہوئی ہے کہ
 بارہ برس کے بعد کشتی مع برات ڈوبی ہوئی نکالی۔ سو
 اس کی بھی کچھ اصل نہیں ہے غرضیکہ ایسے عقیدے
 شرکیہ بدعیہ سے توبہ کرنی چاہیے ورنہ ایمان سے ہاتھ
 دھو بیٹھے۔ حررہ العاجز ابو محمد عبدالوہاب الفنجابی
 -الملتانی

الجواب صحیح سید محمد اسماعیل فرید آبادی بقلم خود۔
 جواب بہت صحیح ہے مولوی دبیر الرحمن صاحب بنگال
 امیر احمد عفی عنہا أبو -عبدالجبار حیدر آبادی، بمہرو قلم
 -محمد عبدالوہاب، پیر محمد انصاری عفی عنہ، ولی محمد
 جواب بہت صحیح، سید عطاء الرحمن عفی عنہ سید محمد

عبدالحمید، سید غلام حسین جواب صحیح ہے روح چھیننا غلط ہے اعتقاد اس پر باطل ہے قادر بخش عفی عنہ-جواب صحیح ہے، تَلَطَّف حسین

مخفی نہ رہے کہ مفتی جزاء اللہ خیر الجزاء نے جو جواب دیا ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے پوجنے والوں اور اس کے رسول برحق کے ماننے والوں کو کافی ووا فی ہے البتہ ضال مضل مشرک ومبتدع کہ جس کے دل اور آنکھ اور کان پر شقاوت و بدعتی کی مہر ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے فی الواقع جو شخص ایسی کرامتوں لاصل لہ کا پیر یا کسی دوسرے ولی و فقیر سے کہ جو مقدرات باری تعالیٰ و تصرفات قادر مطلق سے ہیں قائل و معتقد ہے اس کے مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں خدا ہے چون و چرا کے حکم و قدرت کے مقابلہ میں کسی نبی و ولی کی کچھ پیش نہیں چلتی وہ حاکم سارا جہان محکوم وہ خالق اور سب مخلوق پھر کون اس شہنشاہ دو جہان کے حکم کو رد کر سکتا ہے اپنے کلام معجز میں بیان فرماتا ہے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، سیقولون للہ قل فانی تسحرون۔ یعنی فرمایا اللہ صاحب نے کہ کون ہے وہ شخص جس کے ہاتھ میں ہے قابو ہر چیز کا اور وہ حمایت کرتا ہے اور اس کے مقابل کوئی نہیں حمایت کرتا اگر جانتے ہو۔ وہیں کہہ دیں گے کہ اللہ ہی ہے پھر کہاں سے خبط میں پڑ جاتے ہو اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں۔ لیس الفاعل والقادر والمتصرف الہو یعنی اللہ تعالیٰ و اولیاء ہم القانون الہالکون فی فعلہ تعالیٰ و قدمتہ۔ وسطوتہ لا فعل لہم ولا قدرۃ ولا تصرف لا الان ولا حین کانوا حیا فی الدار الدنیایعنی قادر اور فاعل اور متصرف کوئی نہیں مگر اللہ اور اولیاء اللہ فانی اور گم ہیں اللہ کے فعل میں اور اس کی قدرت اور غلبہ میں نہ ان کا کوئی فعل ہے نہ قدرت نہ تصرف نہ اب یعنی عالم برزخ ہیں اور نہ جب کہ زندہ تھے دنیا میں پس

اس آیت اور عبارت شیخ موصوف سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی اور کوئی کسی کی حمایت نہیں کر سکتا پس ایسی کرامت پیران پیر کی طرف منسوب کرنا محض تہمت و افترا ہے واللہ اعلم بالصواب فقط حررہ حمایت اللہ عفا اللہ عنہ جلیسری۔

ایسی حکایات و کرامات جن میں خدا کے ساتھ مقابلہ یا اس کے کاموں میں کسی قسم کا دخل ہے جا بخلاف مرضی حق تعالیٰ کے ہو محض افترا و بہتان ان بزرگوں پر ہے انبیاء صدیقین و شہدا و صلحاء اور ملائکہ سب اس کے حکم کے آگے دم بخود ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون یعلم ما بین یدہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضیٰ وہم من خشیتہ مشفقون ومن یقل منہم انی الہ من دونہ فذلک نجزیہ جہنم کذلک نجزی

الظالمین یعنی وہ بندے ہیں جن کو عزت دی ہے اس سے بڑھ کر نہیں بول سکتے اور وہ اس کے حکم پر کام کرتے ہیں اس کو معلوم ہے جو ان کے آگے اور پیچھے ہے اور سفارش نہیں کرتے مگر اس کی جس سے وہ راضی ہو اور وہ اس کی بیبت سے ڈرتے ہیں اور جو کوئی ان میں کہے کہ میں خدا ہوں سوائے اس کے سوا س کو ہم بدلہ دیں دوزخ یوں ہی ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔

بزرگان بزرگی تہادہ زسر
فقط حررہ العاجز ابو عبدالرحمن محمد عفی عنہ۔

الجواب صحیح محمد عبدالحکیم عفی عنہ
جواب صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون فقط حررہ عطاء اللہ عفی عنہ
یہ جواب صحیح ہے۔ (ابو محمد سلیم الدین)

ہذا جواب صحیح الجواب صحیح ، ابو عبداللہ محمد نعمت اللہ۔

جواب صحیح ہے دستخط محمد فقیر اللہ الفنجابی شاہپور ریخادم

شریعت متین محمد سلیم الدین عفی عنہ
 الجواب واللہ سبحانہ الموافق للصواب یہ کرامتیں جو سوال
 میں مرقوم ہیں اس کا ردو انکار نہیں ہو سکتا اس واسطے
 کہ اس میں کوئی امر خلاف شرع اور خلاف عقیدہ اہل اسلام
 نہیں ہے اور ایک کرامت اخیرہ اقتباس الانوار میں جو معتبر
 کتاب ہے احوال حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 میں منقول ہے اور دو کرامتینجو پہلی ہیں وہ میری نظر
 سے کسی کتاب میں نہیں گذریں لیکن کتابیں احوال حضرت
 ممدوح میں بہت کثیر ہیں اور میں نے ان کو بالا ستیعاب
 نہیں دیکھا پس ممکن ہے کہ کسی صاحب نے نقل کی
 ہو۔ بہر حال انکار کرنے کی کوئی وجہ وجہہ نہیں معلوم
 ہوتی اور حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ سے ایسی
 کرامتیں بیشتر صادر ہوئی ہیں یہ کرامتیں ان کے کمال اور
 شرف کے سامنے کچھ مقدا رہیں رکھتیں ان کا کمال اس
 سے بہت زیادہ ہے اور یہ امر اہل معرفت پر مخفی نہیں
 ہے اقتباس الانوار میں ہے واز آنحضرت ہر جنس کرامات
 نقل کردہ اند تصرف در ظواہر خلق و بواطن ایشان و
 اجرائے حکم برانس و جن و اطلاع ضمائر و اظہار سرائرو
 تکلم بخواطر و اطلاع بربطائن ملک و ملکوت و کشف حقائق
 جبروت و اسرار لاہوت و اطاء مواہب علیہ و امداد عطا یا
 ولاریبیم و تقلب و تصرف حوادث و دائر و تصرف اکواں
 اثبات الہی و اتصاف بصفات احیاء و اماتت و ابراء اکمہ و
 ابرص و تصحیح مرضی وطی زمان و مکان و نفاذ امور
 زمین و آسمان ونیز بر آب و طیران در ہوا و تصرف ارادت
 مردم انتہی۔ فقط واللہ سبحانہ، اعلم و علمہ اتم مہر مولوی
 ارشاد حسین صاحب رامپوری۔

احمدے محمد ارشاد حسین(مولوی ارشاد حسین صاحب سے)
 تعجب ہے کہ ظاہر ان حکایات کو خصوصاً پہلی حکایت کو
 خلاف شرع نہیں جانتے حق تعالیٰ سے غالب ہونا اور امر

حق عالیٰ کو رد کر دینا اور خدا تعالیٰ کا شیخ قدس سرہ سے ڈرنا۔ تو صاف اس سے واضح ہے اور پھر بھی خلاف قاعدہ شرع کے یہ نہیں تو معلوم نہیں وہ کونسا امر ہے کہ خلاف ہوتا ہے اگر کوئی تاویل مولوی صاحب فرما کر یہ جواب لکھتے تو مضائقہ نہ تھا مگر صاف طور پر ان کو تسلیم کرنا تھا یہ مستبعد ہے علماء سے کہ عوام کی غواہیت کو ایسا لکھنا کافی ہے بہر حال یہ حکایات بظاہر خود کفر اور خلاف قاعدہ شرع کے ہیں۔ خصوصاً پہلی حکایت کہ مسلمانوں کو ایسا عقیدہ نہ کرنا چاہیے اور کمالات شیخ کی عبودیت و بندگی اور عجز تام بدرگاہ حق تعالیٰ کے ہوتا ہے نہ ایسی حکایات واپہ آپ کی شان رفیع تسلیم و رضا و فنا پیش حق تعالیٰ و اوامر حق تعالیٰ کے ہیں۔ چنانچہ ان کے کلمات فتوح الغیب سے واضح لائح ہے نہ کہ مقابلہ امر حق تعالیٰ کا اور مخاصمہ ذات پروردگار کے ساتھ معاذ اللہ الحاصل ان حکایات کی کوئی اصل نہیں یہ وضع کسی ملحد کی ہیں اور شان بزرگان سے بعید ہے کہ ایسی حکایات لکھیں یا اس پر عقیدہ کریں۔ اور جو عبارت مولوی صاحب نے نقل کی ہے اس سے کرامات کا واقع ہونا ثابت ہے نہ مقابلہ و برابری و مکابره حق تعالیٰ کے ساتھ لاحول ولاقوة باللہ مسلمان ایسے عقائد سے احتراز رکھے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ کتبہ الاحقر رشید احمد گنگوہی۔

فی الحقیقت حکایات مندرجہ سوال جس کو سائل کرامات حضرت شیخ قدس سرہ، اعتقاد کرتا ہے حکایات کاذبہ مردودۃ الشرع ہیں نہ کرامات مقبولہ حاشا وکلاشان حصرت غوث اعظم قدس سرہ کے ہرگز ہرگز مقتضی اس کے نہیں ہے کہ ایسے امور مخالف شرع بطور کرامت ان سے صادر ہوویں کہ منافی ولایت ولی ہے اس لئے کہ ولی اس مومن کو کہتے ہیں کہ عارف بذات اللہ والصفات ہو کر حسب امکان عبادت پر مواظبت کرے اور گناہوں اور شہوات و

لذات سے کنارہ کش ہو۔ پس اپنے کو عاجز و مغلوب اور ذات احدیت کو قادر و غالب اعتقاد کرنا اور مخالف اس کے عملاً بھی کاربند نہ ہونا لازم الولیٰ ہے بناءً علیہ جو کہ حکایات اولیٰ اور ثانیہ سے عجز و مغلوبیت خالق الارض والسموات اور غلبہ حضرت شیخ قدس سرہ کاونیز بزوررد کرنیکا حکم حضرت رب العالمین کا صریح لازم ہے اور یہ منافی ولایت پس کرامات حضرت غوث الثلقین رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ہونا ان حکایات کا بالبداہت باطل ہے جو شخص ایسا اعتقاد کرے وہ ملحد ہے نعوذ باللہ من ذلک نہایت تعجب ان علماء سے ہے کہ جو ان حکایات کاذبہ کو کرامات حضرت شیخ قدس سرہ سے قرار دے کر عوام کالانعام کو گمراہ کریں۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیات اعمالنا فقطحرره محمد قاسم علی عنہ مراد آبادی محمد قاسم علی خلف مولانا محمد عالم علی

۲۹. سہشای نیرسن; ای'داد کی শুڈھ راءڈھیر ای ڈھایڈھ

بڈرڈمانے آالےمدےر گاں باڈانوںےر اڈکڈڈ ڈوںشل ہلےو، ڈوںنےر ڈے کاجڈولےو کڈرڈے سرکار باڈا ڈےڈ، سےڈولےو سرکارےر ڈھایڈھ ڈلے ڈالڈے ڈےڈوڈا اڈبڈ سرکارکے سےڈولےو کڈرار ڈنڈ نسیہڈ کڈرا۔ سرکار ڈرڈبڈڈ ڈاڈےر نسیہڈ ڈوںڈڈل کڈنا اڈبڈ کافےرڈےر اڈڈےڈڈا باڈبڈباڈنکارڈ ڈالال سرکار سےڈولےو ڈنڈبے کڈنا ڈا نڈے ڈاڈےر کڈن ماڈاباڈا ڈے ڈے۔ ڈرڈ ڈارا نڈڈےڈےر مڈھان ڈھایڈھ (?) آاڈاڈےر ڈنڈ کڈن ڈرڈبڈ-نڈبڈ ڈا ڈکڈڈاڈ

সরকারকে নসীহত করে দেওয়াই যথেষ্ট মনে করে। আসলে তারা নিজেরাও জানেন তাদের নসীহতে কোন কাজ হবে না।

তো এরকমই একটি বিষয় হলো ই‘দাদ বা জিহাদের জন্য সামরিক প্রস্তুতি। তারা এই মহান ফরীষাকে সরকারের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা দায়মুক্ত হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। অথচ আল্লাহ তায়ালা সকল মুসলমানকে জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের আদেশ দিয়েছেন এবং কারণও বলে দিয়েছেন যে, এর দ্বারা তোমরা কাফেরদের অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করবে, যেন তারা মুসলমানদের দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস না পায় এবং মুসলমানরা তাদের সহজ শিকারে পরিণত না হয়।

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ (তোমরা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করে রাখো, তোমাদের যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্বাবল-সুরা আনফাল, ৬০) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ কেউ কেউ বলেছেন, এই আয়াতে সকল মুসলমানকে সম্বোধন করা হয়েছে। যার দ্বারা বুঝে আসে ইদাদ ফরযে আইন। হানাফী মাযহাবের অন্যতম ফকিহ ইমাম ফখরুদ্দীন যাইলায়ীর (ম্: ৭৪৩ হি.) বক্তব্য থেকেও এমনটাই বুঝে আসে, যা আমরা সামনে উল্লেখ করবো।

আর এ মতটি খুবই যুক্তিসংগত, কেননা শত্রু আক্রমণ করলে জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। আর শত্রু তো যে কোন সময় আক্রমণ করতে পারে, তাই যে কোন সময় জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যেতে পারে। এখন যদি আগে থেকে সামরিক ট্রেনিং গ্রহণ না করা হয় তাহলে অস্ত্র হাতে তুলে দিলেও তো আমরা তা চালাতে পারবো না। তখন সেই অস্ত্র দ্বারা নিজেদের মাথায় আঘাত করা ছাড়া আমাদের আর কি বা করার থাকবে?

অবশ্য অনেক মুফাসসির বলেছেন, স্বাভাবিক অবস্থায় ইদাদ ফরযে কেফায়া, তবে কখনো কখনো তা ফরযে আইন হয়ে যায়। অর্থাৎ যখন জিহাদ ফরযে কেফায়া থাকে তখন ইদাদও ফরযে কেফায়া থাকে আর যখন জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায় তখন ইদাদও ফরযে আইন হয়ে যায়। তো খোলাসা হলো, আলেমগণ কেউ ইদাদকে ফরযে আইন বলেছেন আর কেউ ফরযে কেফায়া বলেছেন, আর ফরযে কেফায়ার অর্থ হলো, প্রয়োজন পরিমাণ মানুষ তা করলে অন্যরা গুনাহ থেকে বেঁচে যাবে, অন্যথায় সকলেই গুনাহগার হবে। কিন্তু কোন মুফাসসিরই ইদাদকে শুধু রাষ্ট্রের দ্বায়িত্ব বলেননি। সুতরাং বর্তমানে কিছু কিছু আলেমদের নিজেদের গা বাঁচানোর জন্য ইদাদকে রাষ্ট্রের দ্বায়িত্ব বলা এবং রাষ্ট্র তা না করলে নিজেরা হাত গুটিয়ে বসে থাকা, মুফাসসিরদের

সর্বসম্মত মত পরিপন্থী একটা মুহদাস বা বেদআতী কথা।

এখানে একথা বলারও *সুযোগ নেই যে, ইদাদের জন্য বিরাট বাজেট, বড় প্রকল্প ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োজন, যা সাধারণত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যতীত সম্ভবপর হয় না। কেননা মুফাসসিরগণ এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ইদাদের জন্য সর্বোচ্চ শক্তি অর্জন করতে হবে, এটম/পারমানবিক বোমা বানাতে হবে, এটা জরুরী নয়, বরং মুসলমানদের সাধ্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ শক্তি অর্জন করবে, হোক তা একটি সাধারণ পিস্তল বা ক্লাশনিকোভ। দেখুন, আজ, আমরা নিরস্ত্র হওয়ায় ওরা বীরের বেশে যেভাবে ইচ্ছা আমাদের মারছে, আমাদের মারতে কোন পরোয়া করছে না। এটাই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْنَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً

‘কাফেররা চায় তোমরা তোমরা তোমাদের অস্ত্রসস্ত্র ও সামানাদি থেকে অসতর্ক হয়ে যাও, তাহলে তারা তোমাদের উপর একবারে ঝাঁপিয়ে পড়বে’। -সূরা নিসা, আয়াত, ১০২
এখন আমাদের অবস্থা হয়েছে বৃদ্ধ বাঘের মত যে তার খাবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, তাই ভীতু শিয়ালের পালও তাকে আক্রমণ করতে সাহস পায়। কিন্তু যদি আমাদের সবার হাতে একটি সাধারণ পিস্তলও থাকতো, তাহলে দেখে

নেওয়া যেত, ওই ন্যাড়া বৌদ্ধ ও হিন্দু মালাউনদের বুকের পাটা কতটুকু। ওদের তো দুনিয়াই সব, মৃত্যুর পরে ওদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী শান্তি, আর আমাদের জন্য দুনিয়া জেলখানা, শাহাদাতের মৃত্যু আমাদের পরম আরাধ্য। ওরা মৃত্যু থেকে পালিয়ে বেড়ায়, আর আমরা মৃত্যুকে হন্য হয়ে *খুজে ফিরি। সুতরাং যদি জিহাদের জন্য মানসিক প্রস্তুতির পাশাপাশি আমাদের অতি সাধারণ সামরিক প্রস্তুতিও থাকতো তাহলে ওরা কখনোও আমাদের সাথে লাগতে আসার সাহস পেত না ইনশাআল্লাহ। ওরা এজন্যই আমাদের মারতে পারছে যে, আমরা কুরআন-সুন্নাহ আমাদের যেভাবে জিহাদ ও শাহাদাতের জন্য পাগল বানাতে চেয়েছিল, আমরা তা না হয়ে উল্টো দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার নামে জিহাদবিদ্বেষী হয়ে বসে আছি, মুনাফিকদের গুণ মৃত্যুর ভয় নিজেদের মাঝে ধারণ করে ভীরা কাপুরুষ হয়ে গেছি, আর ইদাদকে রাষ্ট্রের দায়িত্ব বলে নিজেরা তা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছি। ফলে আমাদের ক্ষেত্রে রাসূলের ভবিষ্যতদ্বানী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছে, ‘অচিরেই তোমাদের (হত্যা এবং তোমাদের দেশ ও সম্পদ লুণ্ঠন করার জন্য) ভিন্নধর্মাবলীরা একে অপরকে আহ্বান করবে, যেভাবে দস্তরখানে উপবেশনকারীরা খাবার গ্রহণের জন্য একে অপরকে আহ্বান করে। ... তোমাদের সংখ্যা হবে অনেক, কিন্তু তোমরা হবে ভাসমান খড়কুটোর ন্যায় (প্রভাবহীন)।

আল্লাহ তায়লা কাফেরদের অন্তর হতে তোমাদের ভয়
*উঠিয়ে নিবেন আর তোমাদের অন্তরে ঢেলে দিবেন ওয়াহান
... (অর্থাৎ) দুনিয়ার ভালোবাসা ও (শহিদি) মৃত্যুতে অনীহা'।
(সুনানে আবু দাউদ, ৪২৯৭ মুসনাদে আহমদ ২২৩৯৭,
শায়েখ আওয়ামা ও শায়েখ শুয়াইব হাদিসটিকে হাসান
বলেছেন। দেখুন, সুনানে আবু দাউদ, তাহকীক শায়েখ
শুয়াইব, ৬/৩৫৫; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, তাহকীক,
শায়েখ আওয়ামা, ২১/৯২ মুসনাদে আহমদের আরেক
হাদিসে (৮৭১৩) আছে, **وما الوهن يا رسول الله! قال: حبكم**
الدنيا وكرهيتكم القتال ‘ওয়াহান হলো, দুনিয়ার ভালোবাসা ও
যুদ্ধকে অপছন্দ করা’। এ হাদিস প্রমাণ করে পূর্বোক্ত
হাদিসে ‘মৃত্যুকে অপছন্দ করা’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শহিদি
মৃত্যুকে অপছন্দ করা)

অনেকে প্রশ্ন করেন, রোহিঙ্গারা যখন মরছেই তো ওরা তো
মেরেও মরতে পারে, শুধু শুধু কেন মরছে? কিন্তু ভাইয়েরা,
জেনে রাখুন, লড়াই করে মরার জন্যও অস্ত্রের প্রয়োজন।
কেননা অস্ত্রধারীদের সাথে খালিহাতে মোকাবেলার জন্য যে
অসীম সাহসের প্রয়োজন তা অধিকাংশ লোকেরই থাকে না।
পক্ষান্তরে অস্ত্র হাতে পেলে ভীরুও সাহসী হয়ে উঠে।

কথা দীর্ঘ হয়ে গেল, তো চলুন, এবার আয়াতের তাফসীরে

মুফাসসিরদের বক্তব্যগুলো দেখি।

১. খেলাফতে উসমানীয়ার শাইখুল ইসলাম হানাফী
মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় ফকিহ ও মুফাসসির আল্লামা আবুস
সাউদ আফেন্দী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৯৮২ হি.) বলেন,

{ وَأَعِدُّوا لَهُمْ } توجيهُ الخطاب إلى كافة المؤمنين لما أن الأمور
به من وظائف الكلّ، ... { مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّن قُوَّةٍ } من كل ما يُتَّقَى
ط. دار 4/32: به في الحرب كأننا ما كان (تفسير أبي السعود
(إحياء التراث العربي)

আল্লাহ তাআলার বাণী وَأَعِدُّوا لَهُمْ (তোমরা তাদের
মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত কর...) এতে সকল ঈমানদারকে
সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা, আদিষ্ট বিষয়টি সকলেরই
দায়িত্ব। ... { مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّن قُوَّةٍ } (তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী
শক্তি) অর্থাৎ যুদ্ধের ক্ষেত্রে শক্তিবর্ধক এমন সব কিছু, চাই
তা যাই হোক না কেন। -তায়সীরে আবুস সাউদ, ৪/৩২

২. হানাফী মাযহাবের অনুসারী আলেম আল্লামা শিহাবুদ্দীন
মাহমুদ আলুসী রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: ১২৭০) তার বিখ্যাত
তায়সীরগ্রন্থ রুহুল মাআনীতে হুবহু একই কথা বলেছেন,
তার ইবারত দেখুন,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ لِكُلِّ مَن لَّمْ يَأْتِكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَمَّا أَن الْمَأْمُورُ بِهِ مِنْ
 وَطَائِفِ الْكُلِّ ... {مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ} مِنْ كُلِّ مَا يُنْقَوِي بِهِ فِي
 الْحَرْبِ كَائِنًا مَا كَانَ. (روح المعاني: 5/220 ط. دار الكتب
 العلمية: 1415 هـ)

আল্লাহ তাআলার বাণী (তোমরা তাদের মোকাবেলার জন্য
 প্রস্তুত কর...) এতে সকল ঈমানদারকে সম্বোধন করা
 হয়েছে। কেননা, আদিষ্ট বিষয়টি সকলেরই দায়িত্ব। ...
 (তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি) অর্থাৎ যুদ্ধের ক্ষেত্রে
 শক্তিবর্ধক এমন সব কিছু, চাই তা যাই হোক না কেন। -
 রুহুল মআনী, ৫/২২০

৩. তাফসীর জগতের উজ্জল নক্ষত্র ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী
 রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ৬০৬ হি.) বলেন,

قال أصحاب المعاني: الأولى أن يقال: هذا عام في كل ما يتقوى
 به على حرب العدو، وكل ما هو آلة للغزو والجهاد فهو من
 جملة القوة ... وهذه الآية تدل على أن الاستعداد للجهاد بالنبل
 والسلاح وتعليم الفروسية والرمي فريضة، إلا أنه من فروض
 ط. دار إحياء التراث 15/499: الكفايات. (التفسير الكبير
 العربي: 1420 هـ)

মুফাসসিরগণ বলেন, এখানে قوة শব্দ দ্বারা যুদ্ধের ক্ষেত্রে

শক্তিবর্ধক সব কিছু উদ্দেশ্য, সুতরাং যা কিছুই যুদ্ধের মাধ্যম হয় তাই قوة বা শক্তির অন্তর্ভুক্ত। ... এ আয়াত থেকে বুঝে আসে জিহাদের জন্য তীর, অস্ত্র ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং অশ্বচালনা ও তীরন্দাজী শিক্ষা করা ফরয, তবে তা ফরযে কেফায়াহ। -তফসীরে রাযী, ১৫/৪৯৯

৪. ইমাম কুরতুবী রহিমাল্লাহ (মৃত্যু: ৬৭১ হি.) বলেন,

قوله تعالى: "وأعدوا لهم" أمر الله سبحانه المؤمنين بإعداد القوة للأعداء بعد أن أكد تقدمه التقوى. فإن الله سبحانه لو شاء لهزمهم بالكلام والتفل في وجوههم وبحفنة من تراب، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه أراد أن يببلي بعض الناس ببعض بعلمه السابق وقضائه النافذ. وكلما تعده لصديقك من خير أو لعدوك من شر فهو داخل في عدتك... وتعلم الفروسية واستعمال الأسلحة فرض كفاية وقد يتعين. (تفسير القرطبي: 8/35-36 ط. دار عالم الكتب)

আল্লাহ তায়ালা তাকওয়া অর্জনে গুরুত্বারোপ করার পর মুমিনদের শক্তি অর্জনের আদেশ দিয়েছেন, আল্লাহ চাইলে ওদেরকে কথা, চেহারায় থুথু নিক্ষেপ বা (ওদের দিকে) একমুষ্টি মাটি নিক্ষেপ করার দ্বারাই পরাজিত করতে পারতেন, যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন, কিন্তু তিনি তার ইলম ও ফয়সালা অনুযায়ী কিছু

মানুষকে অপর কিছু মানুষের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। তুমি তোমার বন্ধুর জন্য যা কিছু ভালো, এবং শত্রুর জন্য যা কিছু মন্দ প্রস্তুত করে রাখো, তার সবই বা প্রস্তুতিগ্রহণের অন্তর্ভুক্ত। অশ্বচালনা শিক্ষা করা এবং অস্ত্রপাতির ব্যবহার রপ্ত করা ফরযে কিফায়া। তবে কখনো কখনো ফরযে আইন হয়ে যায়। -তাফসীরে কুরতুবী: ৮/৩৫-৩৬

৫. আল্লামা আবু হাইয়ান আন্দালুসী রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: ৭৪৫ হি.) বলেন,

العموم في كل ما: والمخاطبون هم المؤمنون ... والظاهر يتقوى به على حرب العدو مما أورده المفسرون على سبيل الخصوص، والمراد به التمثيل، كالرمي وذكور الخيل وقوة القلوب واتفاق الكلمة والحصون المشيدة وآلات الحرب وعددها والأزواد والملابس الباهية، حتى إن مجاهدا رُئي يتجهز للجهاد، وعنده جوالق، فقال: هذا من القوة. وأما ما ورد في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على المنبر، يقول: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي». فمعناه، والله الرمي، كما جاء: «الحج: أعلم: أن معظم القوة وأنها للعدو عرفة». (البحر المحيط: 5/343 ط. دار الفكر: 1420 هـ)

এ আয়াতে মুমিনদের সম্বোধন করা হয়েছে, (অর্থাৎ প্রস্তুতির

আদেশ সব মুমিনের জন্য) আয়াতের স্বাভাবিক অর্থ হলো, এখানে قوة (শক্তি) দ্বারা ঐ সব কিছুই উদ্দেশ্য যেগুলো মুফাসসিরগণ দৃষ্টান্তরূপে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন, তীরন্দাযী, অশ্ব প্রস্তুত রাখা, সাহসিকতা, একতা, মযবুত দূর্গ, যুদ্ধের সামগ্রী, পাথেয়, রেশমী কাপড় (যা শত্রুর চোখ ধাঁধিয়ে দেয়) এমনকি এক মুজাহিদকে স্বপ্নে জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নিতে দেখা যায়, তার কাছে কিছু থলি ছিল, তিনি বললেন, এগুলোও قوة বা শক্তির অন্তর্ভুক্ত। আর সহিহ মুসলিমে উকবা বিন আমের রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদিস, ‘আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিস্বারের উপর বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই শক্তি হলো নিষ্ক্ষেপণ শক্তি, নিশ্চয়ই শক্তি হলো, নিষ্ক্ষেপণ শক্তি’ তো এই হাদিসের অর্থ হলো, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শত্রুদের বিপক্ষে সবচেয়ে কার্যকর শক্তি হলো নিষ্ক্ষেপণ শক্তি। -আলবাহরুল মুহিত, ৫/৩৪৩

6 - গত শতাব্দীর বরণ্য আলেম শায়েখ জামালুদ্দীন কাসেমী রহিমাল্লাহ (মৃ: ১৩৩২ হি.) বলেন,

وأما اليوم، فقد ترك المسلمون العمل بهذه الآية الكريمة، ومالوا إلى النعيم والتترف فأهملوا فرضاً من فروض الكفاية، فأصبحت جميع الأمة أئمة بترك هذا الفرض. (محاسن التأويل: 5/316 ط. دار الكتب العلمية: 1418 هـ)

আজ মুসলমানরা এই আয়াতের উপর আমল না করে
ভোগবিলাসে লিপ্ত হয়ে গিয়েছে এবং একটি ফরযে কেফায়া
দ্বায়িত্ব পালন ছেড়ে দিয়েছে। তাই পুরো উম্মাহই ফরয
তরকের দায়ে গুনাহগার হয়েছে। -মাহাসিনুত তা'বীল,
৫/৩১৬

৭ - হানাফী মাযহাবের অন্যতম ফকিহ ইমাম ফখরুদ্দীন
যাইলায়ী রহ. (ম্: ৭৪৩ হি.) বলেন:

وفي الجامع الصغير: الجهاد واجب، إلا أن المسلمين في سعة،
حتى يُحتاج إليهم، فقوله: «في سعة» إشارة إلى أن مباشرة
القتال لا تجب في كل وقت، بل الاستعداد له كافٍ، وقوله:
إشارة إلى أن مباشرة القتال فرض على «حتى يُحتاج إليهم
الكل عند الحاجة إليهم، وهو النفير العام، لأن المقصود حينئذ لا
تبيين (يحصل إلا بإقامة الكل، فيفترض عليهم مباشرته
الحقائق: 3/242 ط. المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق: 1313
هـ)

জামিউস সগীর কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন: 'জিহাদ
ফরয, তবে - সকলে যুদ্ধে বের হওয়ার - প্রয়োজন না
পড়লে মুসলমানদের জন্য জিহাদে না যাওয়ারও অবকাশ
আছে'। মুহাম্মদ রহ. এর বক্তব্য : 'না যাওয়ারও অবকাশ

আছে' এ থেকে বুঝা যায়, স্বশরীরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ সর্বাবস্থায় ফরয নয়, বরং তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে রাখাই যথেষ্ট। আর তাঁর বক্তব্য: 'সকলে যুদ্ধে বের হওয়ার প্রয়োজন না পড়লে' এ থেকে বুঝা যায়, প্রয়োজন পড়লে সকলের উপরেই স্বশরীরে যুদ্ধ করা ফরয। আর প্রয়োজনের সময়টি হচ্ছে যখন 'নফীরে আম' এর হালত তৈরী হয়ে যায়। কেননা, তখন সকলে যুদ্ধে বের হওয়া ব্যতীত উদ্দেশ্য অর্জন হবে না। কাজেই তখন সকলের উপরই স্বশরীরে যুদ্ধ করা ফরয হবে। -তাবয়ীনুল হাকায়িক: ৩/২৪২

৮ - শায়েখ সুলাইমান আল-উলওয়ান (ফাঙ্কাল্লাহু আসরাহ) বলেন:

وجعلوه إحدى فروض الكفایات، وقد يكون فرض عين على أهل القدرة من الذكور، شأنه في ذلك شأن الجهاد، منه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية. اهـ

আইস্মায়ে কেলাম ই'দাদকে ফরযে কিফায়া সাব্যস্ত করেছেন। তবে সক্ষম পুরুষদের উপর কখনো কখনো ফরযে আইন হয়ে যায়। এর হুকুম জিহাদের হুকুমের অনুরূপ। জিহাদ যেমন ফরযে আইন ও ফরযে কিফায়া দুই ভাগে বিভক্ত; ই'দাদও তেমনি। -ফতওয়া ফী তাওজীহিল

উম্মাহ, পৃ: ১০

ইদাদের সাথে সম্পৃক্ত ইলমী বিষয়গুলো নিয়ে মুফতী আব্দুল ওয়াহহাব হাফিযাহুল্লাহ 'ইদাদ একটি ভুলে যাওয়া ফরয' নামে একটি খুবই উপকারী কিতাব রচনা করেছেন। আমি কিতাবটির লিংক দিয়ে দিচ্ছি। যারা কিতাবটি পড়েননি তারা ইদাদের মাসায়েল জানার জন্য কিতাবটি পড়ে নিতে পারেন। তাহলে ইদাদের বিষয়গুলোতে ভাইদের কোন অসচ্ছতা থাকবে না ইনশাআল্লাহ।

ইদাদ, একটি ভুলে যাওয়া ফরয। ডাউনলোড লিংক
<https://www.pdf-archive.com/2017/05/...tten-fardh.pdf>

২৮.সহিহ হাদিসের আলোকে তাগূতের সংজ্ঞা ও পরিচয়

কুরআন শরিফে তাগূত শব্দটি বারবার এসেছে, তাগূতের সাথে সম্পর্ক ছিল করাকে ইমানের শর্ত বলা হয়েছে, তাগূতের কাছে বিচার প্রার্থনা করাকে কুফর ও নিফাক বলা হয়েছে। যারা তাগূতের কাছে বিচার প্রার্থনা করে তাদের ইমানের দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। তাগূতের পথে যুদ্ধরত ব্যক্তিদের কাফের বলা হয়েছে। সুতরাং তাগূত

শব্দের অর্থ জানার চেষ্টা করা প্রত্যেক মুমিনের নিকট
অপরিসীম গুরুত্বের দাবী রাখে।

মূলত তাগুত একটি ব্যাপক অর্থবহ শব্দ, এ শব্দের ধাতুমূল
হলো طغیان বা সীমালঙ্ঘন করা। সুতরাং তাগুত শব্দের অর্থ
হলো, প্রত্যেক এমন জিনিষ যা মাখলুক বা বান্দা হওয়ার
সীমা অতিক্রম করে রবের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে,
অন্যদের খোদা সেজে বসেছে, ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.
বলেন,

والطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو
إعلام الموقعين عن رب العالمين 1 / 40 دار الكتب (مطاع
العلمية - بيروت الطبعة: الأولى، 1411هـ)

“তাগুত প্রত্যেক এমন জিনিষ যার মাধ্যমে বান্দা নিজের
সীমালঙ্ঘন করেছে, চাই তা উপাস্য হোক কিংবা অনুসরণীয়
ব্যক্তিত্ব।” -ই'লামুল মুওয়াক্কিযীন, ১/৪০

সুতরাং যে মূর্তিগুলোর পূজা করা হয় সেগুলো তাগুত।
কোননা ইবাদত শুধু আল্লাহ তায়ালার প্রাপ্য। কোন
সৃষ্টজীবের ইবাদত করা হলে তাকে আল্লাহর সমতুল্য গণ্য
করা হয়। একাধিক হাদিসে মূর্তিকে তাগুত বলা হয়েছে,
উদাহরণ স্বরূপ দেখুন, সহিহ বুখারী, ১৬৪৩; ৭১১৬ সহিহ

মুসলিম, ১২৭৭; ১৬৪৮ মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯৮৫২

ঠিক তেমনি যে সকল শাসক আল্লাহ তায়ালার আইনের পরিবর্তে মানবরচিত আইন দ্বারা শাসন করে তারাও তাগুত। কেননা আইন দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তায়ালার। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“বিধান প্রণয়নের অধিকার আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নেই। তিনিই এ আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তার ভিন্ন অন্য কারোও ইবাদত করো না। এটাই সঠিক দীন। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।” -সূরা ইউসুফ, ৪০

{ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا }

“তিনি হুকুম প্রদানের ক্ষেত্রে কাউকে শরীক করেন না।” - সূরা কাহাফ-২৬

সুতরাং যারা নিজেদের মনগড়া আইন দ্বারা জনগণকে শাসন করে তারা এর মাধ্যমে নিজেদেরকে রবের আসনে অধিষ্ঠিত করতে চায়, বিধান প্রদানের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শরীক হতে চায়, তাই তারাও তাগুত।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হলো, বর্তমানে যারা মানবরচিত বিধান দ্বারা দেশ শাসন করছে তারা শুধু কাফের-মুরতাদই নয় বরং তারা হলো তাগূত ও সবচেয়ে জঘন্য কাফের। তারা আল্লাহ তায়ালার আইন প্রণয়নের অধিকারকে নিজেদের হাতে নিয়ে নিজেদেরকে খোদার আসনে বসিয়েছে। কিন্তু অনেকেই এ ধরনের শাসকদের তাগূত বলা তো দূরে থাক কাফের বলেও মানতে চান না। তাই আজ আমি কিছু হাদিস পেশ করবো, যার আলোকে তাদের ‘তাগূত’ হওয়ার বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আর মনে রাখতে হবে, কুরআনের ব্যাখ্যার জন্য কুরআনের পরে সর্বোত্তম উৎস হলো সহিহ হাদিস।

প্রথম হাদিস:-

قال جابر: «كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها، في جهينة واحد، وفي أسلم واحد، وفي كل حي واحد، كهان ينزل عليهم الشيطان». (صحيح البخاري 45/6 دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى، 1422هـ-)

জাবের রাযি. বলেন, “যে সকল তাগূতের কাছে তারা বিচারের জন্য যেত তাদের একজন ছিল জুহাইনাহ গোত্রের, একজন আসলাম গোত্রের, এবং এভাবে প্রত্যেক গোত্রে এক-একজন করে তাগূত ছিল। তারা ছিল গণক। তাদের

নিকট জীন-শয়তান আসতো।” -সহিহ বুখারী, ইফা,

৭/৩২৫

নোট:- জাবের রাযি. উল্লিখিত গণকদের তাগুত আখ্যায়িত করেছেন, অথচ মানুষ এ গণকদের পূজা করতো না, বরং শুধু তাদের নিকট নিজেদের মোকাদ্দমা পেশ করতো আর তারা আল্লাহ তায়ালার বিধানের পরিবর্তে নিজেদের মনগড়া বিধান দ্বারা ফয়সালা করতো।

দ্বিতীয় হাদিস:-

عن ابن عباس، قال: «كان أبو بردة الأسلمي يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه، فتنافر إليه ناس من المسلمين، فأُنزل الله - تعالى -: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ} {النساء: 60} إلى قوله: {إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا} {النساء: 62}. رواه الطبراني في المعجم الكبير (12045) وابن أبي حاتم في تفسيره (5547) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: (7 / 6 رقم الحديث: 10934) : رجاله رجال الصحيح.

وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة (32/7) دار الكتب العلمية بيروت الطبعة: الأولى - 1415 هـ) : وعند الطبراني بسند جيد عن ابن عباس، قال: كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود، فذكر القصة في نزول قوله تعالى: أَلَمْ

تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ مِنْ
 قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا
 .النساء: 60 {الآية} ... بِهِ

ইবনে আক্বাস রাযি. বলেন, “আবু বুরদা আসলামী
 ইহুদীদের মাঝে সৃষ্ট বিবাদসমূহের মিমাংসা করতে।
 একবার কিছু মুসলমানও নিজেদের বিবাদ নিরসন করতে
 তার নিকট বিচারপ্রার্থী হয়, তখন আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত
 অবতীর্ণ করেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ
 مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ
 يَكْفُرُوا بِهِ

“(হে নবী!) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাবী করে,
 তারা তোমার প্রতি যে কালাম নাযিল করা হয়েছে তাতেও
 ইমান এনেছে এবং তোমার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে
 তাতেও, (কিন্তু) তাদের অবস্থা এই যে, তারা ফায়সালার
 জন্য তাগূতের কাছে নিজেদের মুকাদ্দমা নিয়ে যেতে চায়?
 অথচ তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল, যেন সুস্পষ্টভাবে
 তাকে অস্বীকার করে।” -সূরা নিসা, ৬০ তাফসীরে ইবনে
 আবী হাতেম, ৫৫৪৭ আলমু'জামুল কাবীর, ১২০৪৫

হাদিসের মান:- হাফেয ইবনে হাযার রহ. (মৃত্যু ৮৫২ হি.)

‘জাইয়িদ’ বলেছেন যা সহিহ ও হাসানের মধ্যবর্তী স্তর।
হাফেয নুরুদ্দীন হাইসামী রহ. (মৃত্যু ৮০৭ হি.) বলেছেন,
“হাদিসের সব বর্ণনাকারীগণ ছিকাহ-নির্ভরযোগ্য।” -
মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাফেয হাইসামী ৭/৬ হাদিস নং
১০৯৩৪ আলইসাবাহ, হাফেয ইবনে হযার, ৭/৩২

নোট:- ইবনে আব্বাস রাযি. সুস্পষ্টরূপে বলছেন,
উপরোল্লিখিত আয়াতে তাগূত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইয়াহুদী
আবু বুরদা, যে ইহুদীদের মাঝে সৃষ্ট বিবাদসমূহে নিজের
মনমতো বিচার করতো।

তৃতীয় হাদিস:-

حدثني محمد بن المثنى قال، حدثنا عبد الوهاب قال، حدثنا
داود، عن عامر في هذه الآية: "ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم
آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى
الطاغوت"، قال: كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين
خصومة، فكان المنافق يدعو إلى اليهود، لأنه يعلم أنهم يقبلون
الرشوة، وكان اليهودي يدعو إلى المسلمين، لأنه يعلم أنهم لا
فاصلحاً أن يتحاكما إلى كاهن من جُهَيْنَةَ، يقبلون الرشوة
فأنزل الله فيه هذه الآية: "ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا
تفسير الطبري ت) . "بما أنزل إليك" حتى بلغ "ويسلموا تسليمًا
أحمد شاکر 508/8 رقم الحديث: 9891، 9892 مؤسسة الرسالة

(الطبعة: الأولى، 1420 هـ

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (5/37 ط. دار الفكر) :
(روى إسحاق بن راهويه في تفسيره بإسناد صحيح عن
الشعبي، قال: كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين
خصومة، وروى الطبري بإسناد صحيح عن ابن عباس: أن
حاكم اليهود يومئذ كان أبا برزة الأسلمي وروى بإسناد
صحيح آخر صحيح إلى مجاهد أنه كعب بن الأشرف

ইমাম শা'বী রহ. বলেন, “এক ইহুদী ও মুনাফিকের মাঝে
একটি বিষয়ে দ্বন্দ্ব ছিল। ইহুদী রাসূলের কাছে বিচার নিয়ে
যেতে চাইলো, কারণ সে জানে রাসূল ঘুষ গ্রহণ করেন না।
কিন্তু মুনাফিক ইহুদী বিচারকদের কাছে মুকাদ্দমা পেশ
করতে চাইলো। কেননা সে জানে, ইহুদী বিচারকরা ঘুষ
গ্রহণ করে, (সে তাদেরকে ঘুষ দিয়ে নিজের পক্ষে রায় নিয়ে
নিবে) এরপর তারা জুহাইনাহ গোত্রের এক ব্যক্তির নিকট
বিচার প্রার্থনা করার ব্যাপারে একমত হলো। তখন পূর্বোক্ত
আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। -তাফসীরে তবারী, ৮/৫০৮ ফাতহুল
বারী, ৫/৩৭

হাদিসের মান:- হাফেয ইবনে হাযার ফাতহুল বারীতে
হাদিসটির সনদকে সহিহ বলেছেন। আর যদিও শা'বী রহ.

তাবেয়ী হওয়ার কারণে হাদিসটি মুরসাল, তবে হাফেয ইযলী (মৃত্যু: ২৬১হি.) ও হাফেয যাহাবী (মৃত্যু: ৭৪৮ হি.) সহ আরো অনেক মুহাদ্দিস শাবী রহ. এর মুরসাল হাদিসকে সহিহ বলেছেন।

আসলে হাদিসে তাগূতের যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তা ব্যতীত উল্লিখিত আয়াতের অন্য কোন ব্যাখ্যা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই সকল মুফাসসিরিন আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন এবং এটা একেবারেই সুস্পষ্ট। কিন্তু তারপরও অনেকেই মানবরচিত বিধান দ্বারা ফয়সালাকারী শাসকদের তাগূত বলতে নারাজ, যারা বলে তাদেরকে উগ্র, খারেজী ইত্যাদি ট্যাগ লাগিয়ে দেন। তাদের নিকট প্রশ্ন, আপনারা আয়াতের কি ব্যাখ্যা করবেন, আপনারা কি বলবেন, আয়াতে তাগূত দ্বারা মূর্তি উদ্দেশ্য। তারা মূর্তির কাছেই বিচার প্রার্থনা করতো!!! এমন হাস্যকর কথা তো আজ পর্যন্ত কেউ বলেননি। না কি আপনারা বলবেন, হাসিনা যেহেতু মানবরচিত বিধান দ্বারা ফয়লাসা করে তাই সে তাগূত, কিন্তু কাফের না, তার কুফর ছোট কুফর!!! আসলে আপনারা কিছুই বলবেন না, আপনারা যা করেন ও ভবিষ্যতেও করবেন তা হলো, বর্তমান শাসকদের কুফরীর দলিল হিসেবে শুধু **وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ** (যারা আল্লাহ তায়ালায় নাযিলকৃত বিধান দ্বারা ফায়সালা

করে না তারা কাফের- সূরা মায়েদা, ৪৪) এই দ্ব্যর্থবোধক আয়াতটি পেশ করবেন এবং বুঝানোর চেষ্টা করবেন যে, উগ্র খারেজীদের (?) বুলিতে শাসকদের কুফর প্রমাণের জন্য এই একটি আয়াতই রয়েছে, এরপর ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য মুফাসসির বক্তব্যদের আলোকে, উক্ত আয়াতে কুফর দ্বারা ছোট কুফর উদ্দেশ্য হওয়ার ব্যাপারে তুমুল আলোচনা করবেন। আর এ আয়াত ছাড়াও যে শাসকদের কুফর প্রমাণের জন্য অসংখ্য দ্ব্যর্থহীন আয়াত রয়েছে সেগুলো সযত্নে এড়িয়ে যাবেন। কিন্তু এ ধরনের অপচেষ্টা দ্বারা আমরা কি কুরআন ছেড়ে দিচ্ছি না, কুরআন অনুযায়ী আমল হতে দূরে সরে যাচ্ছি না? এভাবে চলতে থাকলে তো আমাদের লাঞ্ছনা-অপদস্থতা কখনো ঘুচবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، ويضع به آخرين

“আল্লাহ তায়ালা এই কিতাবের মাধ্যমে বহু লোককে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন এবং এরই মাধ্যমে অনেক জাতির পতন ঘটাবেন।” -সহিহ মুসলিম, ৮১৭।

অর্থাৎ যারা কুরআন অনুযায়ী আমল করবে তাদেরকে মর্যাদা দান করবেন, আর যারা কুরআন মানবে না বা কুরআন অনুযায়ী আমল করবে না তাদের অপদস্থ করবেন। তাই

আসুন, হঠকারিতা পরিত্যাগ করে শাসকদের কুফরের ব্যাপারে মুজাহিদ আলেমগণ যে আয়াতগুলো দলিল হিসেবে পেশ করেন, সেগুলো একটু ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন, তাফসীরের কিতাব হতে সেগুলোর ব্যাখ্যা দেখুন, আয়াতগুলো নিয়ে তাদাব্বুর করুন। এরপর ভেবে দেখুন, কাদের বক্তব্য কুরআনের বেশি নিকটবর্তী। আল্লাহ আমাদের সকলকে হক বুঝার ও মানার তাওফিক দান করুন।
আমীন।

২৯.হাদিস শাস্ত্রের নিরিখে খোরাসানের কালোপতাকা

ডাউনলোড করুন

pdf

<https://mega.nz/#!VtglyYij!cRjNACPlI...DB7Lt3e4-QfFh4>

<https://my.pcloud.com/publink/show?c...1l6z9D17DfRDRk>

ভূমিকা

‘ইমাম মাহদীর সাহায্যার্থে খোরাসান হতে কালোপতাকাবাহী বাহিনী আসবে’ এ হাদিস নিয়ে আমরা অনেকেই প্রান্তিকতার শিকার, কেউ এই হাদিসকে সহিহ মনে করে এটাকেই তালেবান-আলকায়েদার হকের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দলিল মনে করে। আবার কেউ এ হাদিসকে যয়ীফ সাব্যস্ত করে একে পুঁজি বানিয়ে তালেবান-আলকায়েদাকে বাতিল সাব্যস্ত করার চেষ্টা করে।

উভয় ধরনের প্রান্তিকতা থেকে সতর্ক করার জন্যই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। এতে ইনশাআল্লাহ কালোপতাকার হাদিস সহিহ না যয়ীফ এবং এ হাদিসের ব্যাপারে ইমামদের বক্তব্য কি? এ সম্পর্কেও অবগতি লাভ করা যাবে, পাশাপাশি বইয়ের শুরুতে “দুটি মৌলিক বিষয়” শিরোনামের লেখাটি পড়ে নিলে কালোপতাকা ও এজাতীয় অন্যান্য হাদিসের ব্যাপারে শরিয়তের মূলনীতি কি? তা সহিহ বা যয়ীফ হওয়া কোন দলের হক বা বাতিল হওয়ার দলিল কি না? এ ব্যাপারেও স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা যাবে, ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য, ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসের শাস্ত্রীয় বিষয়গুলো জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন, এটা তাদের বিভ্রান্তির কারণ হতে পারে। কিন্তু যখন আমাদের নীরবতার সুযোগ নিয়ে একদল নামধারী আলেম ও শায়েখ এ বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তান (نحسبهم كذلك، والله حسيبهم) আল্লাহর পথের মুজাহিদদের বিপক্ষে অপপ্রচার করে তখন জিহাদ ও মুজাহিদদের সমর্থনকারীদের জন্য হক প্রকাশ না করে চুপ থাকার অবকাশ থাকে না।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন।
সত্যকে জানা ও গ্রহণ করার তাওফিক দান করুন।

اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَاللَّهْمْنَا اتِّبَاعَهُ، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، وَاللَّهْمْنَا اجْتِنَابَهُ

৩০. হিজরত ও কাট অফ হওয়ার বারাকাহ ও কল্যাণ

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعًا كَثِيرًا وَسَعَةً

“যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে হিজরত করবে, সে জমিনে বহু জায়গা ও প্রশস্ততা পাবে।” -সূরা নিসা, ১০০

আয়াতে হিজরতের দুনিয়াবি ফায়েদা ও কল্যাণ সুস্পষ্ট। এখন প্রশ্ন হলো, আমাদের যেসব ভাইয়েরা জিহাদের প্রয়োজনে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন তারা কি এ বারাকাহ ও কল্যাণ লাভ করবেন? উত্তর, হ্যাঁ, তারাও ইনশাআল্লাহ এ বারাকাহ লাভ করবেন।

আল্লাহ তায়ালা সূরা কাহাফে সেই সাত যুবকের আলোচনা করেছেন, যারা নিজেদের দ্বীন রক্ষার জন্য পরিবার ও জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। তারা শাহী খান্দানের লোক ছিল এবং বাদশাহ ও তাদের জাতিকে তারা ঈমানের দাওয়াত দিয়েছিলো। বাদশাহ তাদের ঈমানের দাওয়াত গ্রহণ না করলেও তড়িঘড়ি করে তাদেরকে কোন শাস্তি দেয়নি। বরং তাদেরকে কিছুটা অবকাশ দিতে চেয়েছিলো, যেন তারা নিজেদের মত পুনর্বিবেচনা করে। তখন তারা পরস্পর পরামর্শে বলে,

وَإِذْ اعْتَرَلْتُمُوهُمْ وَمَا يُغْنِيُونَ إِلَّا اللَّهُ فَأَوْرَا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا

“তোমরা যখন তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে এবং তারা
 আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদت করে তাদের থেকেও،
 তখন চলো، ওই গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করো। তোমাদের
 প্রতিপালক তোমাদের জন্য নিজ রহমত বিস্তার করে দেবেন
 এবং তোমাদের বিষয়টা যাতে সহজ হয় সেই ব্যবস্থা করে
 দেবেন।” -سُورَةُ كَاثِفٍ، ١٦

আয়াতের তাফসীরে আল্লামা শিব্বীর আহমদ উসমানী রহ.
 বলেন،

یعنی جب مشرکین کے دین سے ہم علیحدہ ہیں تو ظاہری
 طور پر بھی ان سے علیحدہ رہنا چاہئے۔ آپس میں یہ
 مشورہ کر کے پہاڑ کی کھوہ میں جا بیٹھے۔

অর্থাৎ যেহেতু মুশরিকদের দ্বীন থেকে পৃথক হয়ে গেছি, তাই
 বাহ্যিকভাবেও তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া প্রয়োজন,
 তারা পরস্পর এই পরামর্শ করে গুহায় আশ্রয় নিলো। -
 তাফসীরে উসমানী, পৃ: ৩৮২

এবার তাদের পৃথক হওয়ার কল্যাণ ও বারাকাহ দেখুন।
 ইরশাদ হচ্ছে,

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَرَاوِرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا
 غَرَبَتْ تَقْرَضُهمُ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ
 اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا
 (17) وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ
 الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ
 مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمَلْنَا مِنْهُمْ رُعْبًا

(সে গুহাটি এমন ছিল যে,) তুমি সূর্যকে তার উদয়কালে
 দেখতে পেতে তা তাদের গুহার ডান দিক থেকে সরে চলে
 যায় এবং অস্তকালে বা দিক থেকে তার পাশ কেটে যায়।
 আর তারা ছিল গুহার প্রশস্ত অংশে (শায়িত)। এসব
 আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ যাকে হিদায়াত
 দেন, সেই হিদায়াতপ্রাপ্ত হয় আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন
 তুমি কখনোই তার এমন কোন সাহায্যকারী পাবে না, যে
 তাকে পথপ্রদর্শন করবে। (তাদের দেখলে) তোমার মনে
 হতো তারা জাগ্রত, অথচ তারা ছিল নিদ্রিত। আমি
 তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাচ্ছিলাম ডানে ও বামে। আর
 তাদের কুকুর গুহামুখে সামনের পা দুটি ছড়িয়ে (বসা) ছিল।
 তুমি যদি তাদেরকে উঁকি মেরে দেখতে, তবে তুমি তাদের
 থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাতে এবং তাদের ভয়ে
 পরিপূর্ণরূপে ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়তে। -সূরা কাহাফ, ১৭-১৮

আল্লামা উসমানী রহ. বলেন,

یعنی خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے انہیں ایسے ٹھکانے کی طرف رہنمائی کی جہاں مامون و مطمئن ہو کر آرام کرتے رہیں نہ جگہ کی تنگی سے جی گھٹے ، نہ کسی وقت دھوپ سنائے ۔ غار اندر سے کشادہ اور ہوادار تھا اور جیسا کہ ابن کثیر نے لکھا شمال رویہ ہونے کی وجہ سے ایسی وضع و ہیأت پر واقع تھا جس میں دھوپ بقدر ضرورت پہنچتی اور بدون ایذاء دیے نکل جاتی تھی۔ کہتے ہیں سوتے میں ان کی آنکھیں کھلی رہتی تھیں اور اس قدر طویل نیند کا اثر ان کے ابدان پر ظاہر نہیں ہوا اس سے کوئی دیکھے تو سمجھے جاگتے ہیں اور حق تعالیٰ نے ان لوگوں میں شان بیبت و جلال اور اس مکان میں دہشت رکھی تا لوگ تماشہ نہ بنائیں کہ وہ بے آرام ہوں

“अर्थात् आल्लाह तायाला तार असीम ক্ষमतावले तादेरके एमन आशयस्त्रलेर सक्कान दिलेन, येखाने तारा निश्चित्ते आराम करते पारवे। जायगार संकीर्णतार कारणेओ तादेर खाराप लागतो ना एवं रोदेर कारणेओ तादेर कोन कष्ट हतो ना। गुहाटि बेश प्रशस्त छिल, ताते पर्याप्त वायु चलाचल करते। इबने कासीर रह. बलेन, उतुरमुखी हओयार कारणे गुहाटिर अवस्थानस्त्रल एमन छिल ये, ताते यतटुकु रोद प्रयोजन ततटुकुइ पौँछतो एवं कोन कष्ट देया व्यतीत बेर हये येतो। बला हय घुमन्त अवस्थाय तादेर चोख खोला छिल एवं एतदीर्घ समय घुमानो स्वहेओ तादेर शरीरे एर कोन प्रभाव देखा याछिल ना। वरं तादेरके देखले जाग्रत मने हतो। आल्लाह तायाला तादेर माळे भावगास्त्रीय एवं सेइ स्थानटिके तीतिकर वानिये

রেখেছিলেন, যে কেউ তাদেরকে নিয়ে তামাশা না করে এবং তাদের আরাম বিঘ্নিত না হয়। -তায়সীরে উসমানী, পৃ: ৩৮২

এখানে লক্ষণীয় হলো, আসহাবে কাহাফ কিন্তু নিজেদের দেশ ছেড়ে হিজরত করেননি। তারা দারুল কুফর ছেড়ে দারুল ইসলামেও হিজরত করেননি। বরং তারা নিজেদের শহরেরই বাহিরে নিকটবর্তী কোন একটি পর্বতগুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। এজন্যই যখন তারা তাদের যুগের মুদ্রা দিয়ে একজনকে খাবার আনতে শহরে পাঠালেন, তখন তাকে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেছিলেন, কারণ যদি বাদশাহ তাদের ব্যাপারে অবগত হয়ে যায় তাহলে তাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করবে কিংবা জোরপূর্বক তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নিবে। তাদের তিনশো বছর পুরানো মুদ্রা দেখেই সমকালীন বাদশাহ বুঝতে পারেন এরাই তারা যারা বহুপূর্বে আমাদের শহর হতে আশ্চর্যজনক ভাবে লাপাত্তা হয়ে গিয়েছিলো, এবং এ কারণে তৎকালীন বাদশাহ তাদের নাম-পরিচয় লিখে শাহী খাজানায় রেখে দিয়েছিলো।

এ থেকে সুস্পষ্টরূপে বুঝে আসে, তারা কাফের বাদশাহর অধীনস্থ এলাকায়ই ছিলেন। তার অধীনস্থ এলাকা ছেড়ে অন্য কোন দেশ বা দারুল ইসলামে হিজরত করেননি। সুতরাং তাদের অবস্থা আমাদের কাট-অফ ভাইদের সাথে

পুরোপুরিই মিলে যায়। তাঁরাও তো দ্বীন কায়েম ও জিহাদের জন্য নিজেদের ঘরবাড়ি-পরিবার পরিজন ছেড়েছেন এবং তাগুত সরকারের থেকে আত্মরক্ষার জন্য সেফ-হাউসে আশ্রয় নিয়েছেন। সুতরাং তাঁরাও ইনশাআল্লাহ সে কল্যাণ ও বারাকাহ লাভ করবেন।

এমনিতেও যারা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন, তাদের কাছ থেকে আমরা শুনেছি, আলহামদুলিল্লাহ, তারা আগের চেয়ে অনেক সুখে-শান্তিতে আছেন। আর তাদের সবচেয়ে বড় সুখ হলো আল্লাহ তায়ালার হুকুম পালন করতে পারার মানসিক প্রশান্তি।

আসলে হিজরত, জিহাদ এবং ওয়ালা বারা এগুলো হলো, মুমিনদের ঈমানের কষ্টিপাথর। এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা পরীক্ষা করেন, কে তার ওয়াদার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে, তার উপর ভরসা করে, পরম নিশ্চিত্তে এগিয়ে যেতে পারে, আর কে ঈমানী দুর্বলতার কারণে কষ্টের ভয়ে হিজরত ও জিহাদ হতে পিছিয়ে যায়। হাদিসে এসেছে,

إن الشيطان قعد لاین آدم بأطرقه، ففعد له بطريق الإسلام، فقال: تسلّم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك، فعصاه فأسلم، ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر وتدع أرضك وسمائك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، فعصاه فهاجر، ثم

قعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد فهو جهد النفس والمال،
 فتقاتل فتقتل، فتتكح المرأة، ويقسم المال، فعصاه فجاهد، فقال
 رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فمن فعل ذلك كان حقا على
 الله عز وجل أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله عز
 وجل أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله
 سنن «الجنة، أو وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة
 (3134) النسائي

“শয়তান বনী আদমের সকল পথে বাধা প্রদান করে,
 কুমন্ত্রণা দেয়। সে ইসলাম গ্রহণের পথে বাধা দিয়ে বলে,
 তুমি ইসলামগ্রহণ করে বাপদাদা ও পূর্বপুরুষদের ধর্ম ছেড়ে
 দিবে? যদি বনী আদম শয়তানের অবাধ্যতা করে ইসলাম
 গ্রহণ করে তবে শয়তান হিজরতের পথে তাকে বাধা দেয়।
 সে বলে, তুমি তোমার জমিন ও (পরিচিত) আকাশ ছেড়ে
 হিজরত করবে? অথচ মুহাজিরের দৃষ্টান্ত তো সেই (দড়িতে
 বাধা) ঘোড়ার ন্যায় যে নিজের দড়িতেই ঘুরতে থাকে
 (স্বাধীনভাবে কোথাও যেতে পারে না) যদি সে শয়তানের
 অবাধ্য হয়ে হিজরত করে তবে শয়তান জিহাদের পথে
 তাকে বাধা দেয়। সে বলে, তুমি জিহাদ করবে? জিহাদে তো
 জান কষ্ট পায়, মাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তুমি যুদ্ধ করে নিহত
 হবে, তখন তোমার স্ত্রীকে অন্য কেউ বিবাহ করবে, তোমার
 ধনসম্পদ ভাগ-বাটোয়ারা করা হবে। যদি সে শয়তানের
 অবাধ্য হয়ে এ কাজগুলো করতে পারে তাকে জান্নাতে

প্রবেশ করানো আল্লাহ তায়ালায় উপর অবধারিত হয়ে যায়।
সে (যুদ্ধে) নিহত হলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহ
তয়ালায় উপর অবধারিত হয়ে যায়। (তেমনিভাবে) পানিতে
ডুবে কিংবা উট-ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করলেও
তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহ তায়ালায় উপর
অবধারিত হয়ে যায়। -সুনানে নাসায়ী, ৩১৩৪

তবে পরীক্ষার অর্থ এই নয় যে, সকলেরই দূর্বিশহ কষ্ট
সহিতে হবে। বরং অনেক সময়ই আমরা আল্লাহ তায়ালায়
আদেশ পালনার্থে পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে গেলে পরীক্ষা শেষ হয়ে
যায়। যেমন ইসমাইল আলাইহিস সালামকে কুরবানী করা
ইবরাহীম আলাইহিস সালামের জন্য পরীক্ষা ছিল। পবিত্র
কুরআনে আল্লাহ তায়ালা একে সুস্পষ্ট পরীক্ষা বলেছেন।
(সূরা সাফফাত, ১০৬) কিন্তু ইবরাহীম আলাইহিস সালাম
যখন কুরবানী করার জন্য পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে গেলেন, প্রিয়তম
পুত্রের গলায় ছুরি চালিয়ে দিলেন, ব্যাস পরীক্ষা শেষ হয়ে
গেলো, কুরবানী করতে হলো না। তো জিহাদের প্রয়োজনে
আমরা যদি আমাদের সাজানো ঘরবাড়ি এবং প্রিয় পরিবার
ও আত্মীয়স্বজন ছেড়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে বের হয়ে
যেতে পারি তাহলে ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ আমাদের আগের
চেয়েও বেশি সুখ-শান্তি দান করবেন।

হাঁ, কখনো আল্লাহ তায়ালা তার হিকমাহ অনুযায়ী কাউকে সাময়িক বা দীর্ঘস্থায়ী কষ্টও দেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদেরকেই এই কষ্ট দেন যারা এ কষ্ট সহ্য করতে পারবে এবং এর বিনিময়ে আখেরাতে মহাপ্রতিদান লাভ করবে। যেমনটা প্রসিদ্ধ হাদিসে এসেছে, “মানুষকে তার দ্বীন অনুপাতে কষ্টে ফেলা হয়, যদি তার দ্বীনদারী মযবুত হয় তবে তার কষ্টও কঠিন হয়।” তাই এ নিয়ে পেরেশান হওয়ার বা ঘাবড়ানোর কিছু নেই। আলহামদুলিল্লাহ যারা জেল-জুলুমের শিকার হচ্ছেন বা হয়েছেন আমরা দেখেছি তাদের প্রায় সবারই ইমান এবং জিহাদের স্পৃহা আরো দৃঢ় হয়েছে। তাগুতরা তাদেরকে এ মানহাজ হতে একচুলও সরাতে পারেনি, কখনো পারবেও না ইনশাআল্লাহ।